উৎসর্গ

মঞ্জুশ্রী-জয়শ্রী-গীতশ্রী-বনশ্রী-শান্তশ্রী

ও সুগতকে

নিবেদন

'সাহিত্য ভাবনা' বইটি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় 'সাহিত্য ভাবনা : নব পর্যায়ে' গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত সব কয়টি প্রবন্ধই নতুন, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া 'সাহিত্য ভাবনা' বইয়ের কোন প্রবন্ধই এতে নেওয়া হয়নি। সুতরাং পাঠক এ বইয়ে সম্পূর্ণ একটি নয়া পুস্তকের মুখোমুখি হলেন।

রচনাগুলি গত কয়েক বছরের ভিতর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন সেগুলিকে গ্রন্থাকারে একত্র সংবদ্ধ করা হলো। পত্রিকাগুলির নাম—চতুষ্কোণ, বাংলাদেশ, রবীন্দ্রসদন রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ, সাহিত্য (কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়), নন্দন, সত্যযুগ, গল্পগুচ্ছ, চেতনিক, শিক্ষক এবং বেশ কিছু আগেকার সাপ্তাহিক বসুমতী।

পপুলার লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত আমার পূর্ব-পূর্ব বইয়ের মত এ বইয়ের প্রকাশনায়ও পপুলার লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীসুনীল-কুমার ঘোষ বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। তাঁকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাই।

ছাপায় কিছু কিছু প্রমাদ রয়ে গেল। তার জন্য আর কেউ বা কিছু দায়ী নয়, আমার দৃষ্টিক্ষীণতাই মূলতঃ দায়ী। পাঠক ওই সব মুদ্রণ ঘটিত বিচ্যুতি প্রসন্ন ক্ষমায় উপেক্ষা করবেন বলে আশা করি।

পরিশেষে, 'নব পর্যায় সাহিত্য ভাবনা' তার পূর্ববর্তী বই 'সাহিত্য ভাবনা'র মত একই রকম ঔৎসুক্যের সঙ্গে পঠিত ও আদৃত হলে বিশেষ পরিতোষের কারণ ঘটবে।

নারায়ণ চৌধুরী

সূচীপত্র

মাইকেল মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব

মধুসূদনের নামের আগে 'মাইকেল' কথাটা ব্যবহার করতেই আমার ভাল লাগে। তাঁকে 'শ্রী'যুক্ত করে আমাদেরই দলে ফেলার চেষ্টা জাতীয়তার পরিসূচক হতে পারে, কিন্তু তাতে মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের প্রতি যথাযথ সুবিচার করা হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' আবাল্য এই নামের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে মনোমধ্যে এই নামটির অর্থের, তাৎপর্যের, স্মৃতির এমন একটি অনুষঙ্গ দাঁড়িয়ে গেছে যে, আজ সেই অনুষঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে তাকে শ্রীভূষিত করবার চেষ্টা করলে সেটা কেমন যেন কৃত্রিমতা দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। মধুসূদনের তিরোধানের পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধে প্রথম 'শ্রীমধুসূদন' কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর ওই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও একাধিক লেখক জাতীয় অভিমানের পরিতৃপ্তিকর এই অভিধার স্মরণ নেন। মোহিতলাল তো তাঁর গ্রন্থের নামই দিয়েছেন —'কবি শ্রীমধুসূদন'।

যে সকল মান্য পূর্বাচার্যগণ মধুসূদনের মাইকেল উপাধি খারিজ করে তাঁকে শ্রীমণ্ডিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের ভাবখানা সম্ভবত এই যে, মধুসূদন বাহ্যত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও মনেপ্রাণে ছিলেন বাঙালী, তাঁর সমগ্র সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর যে মনের প্রকাশ ঘটেছে তা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সৌগন্ধে ভরপুর, সুতরাং তিনি আমাদেরই একজন, তাঁকে মাইকেলী চাপকান চড়িয়ে দূরে ঠেলে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। বাইরে ধরাচূড়াটা তাঁর বিজাতীয় হতে পারে কিন্তু অন্তরে তিনি খাঁটি বাঙালী!

পূর্বসূরীদের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার অবশ্য কোণ কারণ নেই। বাস্তবিক, মধুসূদনের নাটকে কাব্যে ও চিঠিপত্রাদিতে এবং অন্যান্য লেখায় তাঁর যে-মনের প্রতিফলন ঘটেছে তা ভারতীয়তায় ওতপ্রোত। এবং ঠিক এইটেই কারণ, যার জন্যে মধুসূদনকে স্বধর্মত্যাগী জেনেও বাঙালী পাঠকের তাঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে এতটুকু আটকায় নি। (প্রসঙ্গত বলি, তৎকালীন বাঙালী সমাজের এটি গভীর রসগ্রাহিতারই প্রমাণঃ তাঁরা যে মধুসূদনের ধর্মকে আমল না দিয়ে তাঁর কাব্যকে আমল দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় বাঙালীর চিত্ত সাহিত্যরসোপভোগের ক্ষেত্রে অনুদারতামুক্ত —

ধর্মীয় বা অন্যবিধ কোন সংকীর্ণতা তাঁর গুণগ্রাহিতায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। বাঙালী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আছে বলেই নানা দুর্দৈব আর ভাগ্যবিপর্যয় সত্ত্বেও সে আজিও সাহিত্যক্ষেত্রে সজীব রয়েছে, নয়ত কী হতো বলা কঠিন।)

কিন্তু সৃষ্টিকার্যের ভিতর স্বাজাতিকতা আবিষ্কার করা এক, আর যিনি স্রষ্টা তাঁকেও ওই নজীরে স্বাজাতিকতার গণ্ডীভুক্ত করবার চেষ্টা করা আর। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন এত সহজ বা সরল নয় যে তাঁকে এইরকম একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই শ্রেণী বা ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। আসলে মধুসূদনের ব্যক্তিজীবন ছিল নানাবিধ বৈসাদৃশ্যে ভরা। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ, কিন্তু তাঁর প্রতিভা কোন স্থির লক্ষ্যের অবিচলত্ব পায় নি, ফলে নানা পরস্পর বিরোধী আশা ও আকাঙ্ক্ষার আবর্তনে মথিত হয়ে তাঁর জীবন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেছে। এই কেন্দ্রাতিগতার জন্যেই তিনি তাঁর দেশবাসীকে যা দিয়ে যেতে পারতেন তার সামান্য অংশমাত্রই দিয়ে যেতে পেরেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর সক্রিয় সৃষ্টিশীলতার কাল বলতে গেলে মাত্র ছয় বছর (১৮৫৯-৬৫)—এই অশেষফলপ্রসূ কালসীমার অন্তে তিনি পুনরায় তাঁর স্বভাবের বৈপরীত্যে প্রবেশ করেছেন, প্রবেশ করে নিজের প্রতি অবিচার করেছেন, দেশবাসীকেও বঞ্চিত করেছেন। মোমবাতির দুই দিকই তিনি পুড়িয়েছেন সমান ক্ষিপ্রতায় ও সমান অবলীলায়, ফলে ছয় বছরও যে তিনি একটানা সৃষ্টিকার্যে রত থাকতে পেরেছেন সেইটেকেই এক-এক সময় বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

মানুষের মন, বিশেষত প্রতিভাধর শিল্পী মানুষের মন, যে কত জটিল আর আঁকাবাঁকাপথসঞ্চারী, তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন মধুসূদনের জীবন। 'দত্তকুলোদ্ভব কবি' মধুসূদন অন্তরের অন্তঃস্থলে ছিলেন খাঁটি বাঙালী, খাঁটি ভারতীয়, এ কথা প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে না—তাঁর নাটক ও কাব্যমধ্যে সে-পরিচয় তিনি দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যচরিত্রের মজ্জাগত অসংগতির পরিচয়টাও তিনি আবার কৌতূহলপ্রদভাবে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে তাঁর বহিরঙ্গ জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে। যে-কবি কবিগুরু বাল্মীকির পদাম্বুজ বন্দনা করে কাব্যারম্ভ করেছেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্বদেশীয় কবিদের অনুকরণে শ্বেতভুজা ভারতীর পদচ্ছায়া প্রার্থনা করেছেন, তাঁর কাব্যকল্পনার শ্রেষ্ঠ স্ফূর্তির জন্য কথায় কথায় যাঁর রচনায় রামায়ণ মহাভারত-পুরাণাদি-বৈষ্ণব কাব্যকবিতার উপমা বিকীর্ণ, সেই কবির ব্যক্তি-জীবনে

সাহেব সাজবার জন্যে কী দুর্নিবার আকুলতারই না প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। অনেকেই এ বিষয়ে আজ একমত যে, মধুসূদন যে, খ্রীশ্চিয়ান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সে কোন ধর্মীয় আকূতির প্রেরণায় নয়, আধ্যাত্মিক অভীপ্সাবশতও নয়, নিতান্ত স্থূল বৈষয়িকতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর এই ধর্মান্তর অবলম্বনের মূলে ছিল। আরও চাঁছাছোলা ভাবে বলতে গেলে, বিলাত-যাত্রার ছাড়পত্র সংগ্রহের উপায় হিসাবেই তাঁর ওই বিজাতীয়তার বর্মধারণ। ধর্ম নিয়ে এমন ছেলেখেলা করা গড়পরতা সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না—কিন্তু প্রতিভাশালী মানুষের রীতিই আলাদা। তাঁর জীবনের ছককে সাধারণ মানুষের মাপে মেলাতে গেলে পদে পদে বিড়ম্বিত হবার সম্ভাবনা।

আরও যেটা তাজ্জবের ব্যাপার তা হলো: যে-কবি মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১) আর বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) লিখে বাঙালী পাঠকের চিত্ত নিঃশেষে জয় করে নিয়ে খ্যাতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরূঢ় হয়েছিলেন, সেই কবির কিনা হঠাৎ ব্যারিস্টার বনবার সাধ জাগল এবং কবিখ্যাতি, দেশবাসীর অমিত ভালবাসা, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সব হেলায় পেছনে ফেলে রেখে তিনি সহসা ইউরোপের অভিমুখে পাড়ি জমালেন। জাতীয়তা আর বিজাতীয়তার এককালীন টানাপোড়েনের কী বিসদৃশ দৃষ্টান্ত! বোধহয় মধুসূদনের মতো খাপছাড়া, আত্মখণ্ডনকারী, বৈপরীত্যময় প্রতিভার পক্ষেই এমনটা সম্ভব, নতুবা এ কথা কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে, যে-কবি কয়েক বছরের কাব্যসাধনাতেই শিল্পোৎকর্ষের প্রায় চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করেছিলেন, তিনি হঠাৎ নিতান্ত স্থূল এক বহির্মুখ উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় কাব্যের সিদ্ধিকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো অবহেলায় বর্জন করে অনিশ্চিত বৈষয়িক সিদ্ধির মায়া-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন করতে ছুটবেন? এ যদি কাঞ্চন ফেলে আঁচলে কাঁচ বাঁধবার দৃষ্টান্ত না হয় তো তাকে আর অন্য কী নামে অভিহিত করা চলে জানিনে।

যদি বলেন অলঙ্ঘনীয় জীবিকার প্রয়োজনে কাব্যসিদ্ধিকে গৌণ স্থান দিয়ে ব্যারিস্টারি-মৃগয়াকে প্রধান অনুশীলনের বিষয় করা ছাড়া তাঁর পক্ষে ওই মুহূর্তে আর অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না; তাঁর উত্তরে বলব, এটাও উদ্দাম প্রতিভার স্ব-বিরোধিতারই এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ। মধুসূদন স্বীয় সাধনার বলে অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু শক্তির অপচয় রোধ করে কেমন করে সেই প্রতিভাকে সর্বতোমুখী

সার্থকতায় ভূষিত করা যায় তার কৌশল তাঁর জানা ছিল না। এককথায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার করে বলি, শক্তির সঞ্চয় ছিল তাঁর অপরিমিত কিন্তু শক্তির 'গার্হস্থ্যপনা' তাঁর ছিল না। বিচক্ষণ বিবেচনা, পরিণাম ভেবে কাজ করা, অপরের দিকটা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—এসব মধুসূদনের কোষ্ঠিতে লেখেনি।

তার অর্থ, মধুসূদন ছিলেন একান্তভাবেই আত্মনিবিষ্ট মানুষ, আরও স্পষ্ট করে বললে, আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে ছিলেন তিনি নিজে, বিশ্বসংসারের অপর কোন মানুষের জায়গা সেখানে ছিল না। শিল্পীরা কম-বেশী প্রায় সকলেই আত্মকেন্দ্রিক হন, কিন্তু মধুসূদনের বেলায় এই আত্ম-মনস্কতা প্রায় একটা obsession বা আবেশে পরিণত হয়েছিল। তিনি আপনাকে বাদ দিয়ে কোন কিছু ভাবতে বা করতে জানতেন না। নীতি-বাদী দৃষ্টিকোণের বিচারে হয়তো এই আত্যন্তিক আত্মনিবেশের অভ্যাস দূষ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার না করে পারা যায় না যে, ওই আত্মলীনতা বা আত্মমনস্কতা বা আত্মকেন্দ্রিকতা যা-ই বলুন তা ই ছিল মধুসূদনের শিল্পসৃষ্টির চরমোৎকর্ষের অবিসম্বাদী উৎস। নিজ জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি প্রেরণা বেদনা মোহ আর মোহভঙ্গের মনস্তাপ প্রভৃতি বিচিত্র মানসিকতার সম্মিলিত ফল হল তাঁর কাব্য। মিল্টনের অনুকরণে লিখতে গিয়েছিলেন মহাকাব্য, তাঁরই কপালগুণে বা দোষে হয়ে দাঁড়ালো কিনা আত্মমুখী গীতি-কবিতার চরিত্রলক্ষণে জরজর। মানুষটি ছিলেন প্রচণ্ড আবেগের এক আধার। তাঁর অহংমন্যতায়, তাঁর প্রয়োজনাতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ে, তাঁর দম্ভের আস্ফালনে যেমন এই আবেগের এক রূপ, অন্যদিকে তেমনি একই আবেগের অভিব্যক্তি দেখতে পাই তাঁর অসঙ্কোচ অনুতাপে বা অনুশোচনায়, তাঁর নিজ মুখে নিজ ভুলের অকপট স্বীকৃতিতে তাঁর করুণ বিলাপে। 'আত্মবিলাপ'-এর মতো প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে লেখা এমন অকপট-হৃদয়োচ্ছ্বসিত অনুতাপ গাথা বাংলা কাব্যে আর নেই। ওই রচনাই প্রমাণ, মধুসূদন অহংকারেও যেমন দুর্ধর্ষ ছিলেন, তেমনি দীনতার চেতনায় ধূলিতে আপনাকে মিশিয়ে দিতে পারার সরলতাতেও তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না বাংলা কবিকুলের মধ্যে। তাঁর আবেগাতিরেক পদে পদে তাঁকে আচরণের বিপরীত প্রান্তে নিয়ে ফেলেছেঃ হয় তিনি অপরিসীম দম্ভী, নয় তিনি তৃণাদপি সুনীচ—ভাবের বা ব্যবহারের মধ্যপথে বিচরণের অভ্যাস তাঁর ছিল না।

দম্ভের কথাই যদি উঠল, গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশব গাঙ্গুলী প্রমুখ বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা ইংরেজী চিঠিগুলিই এ কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সব পত্রেরই কেন্দ্রমধ্যে বিরাজিত তিনি স্বয়ং, যাঁদের উদ্দেশ করে পত্র লেখা হচ্ছে তাঁরা নিমিত্ত মাত্র। 'বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে আমি বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেব,' 'এমন নাটক লিখব যা এর আগে আর কেউ লেখেনি,' 'বীরগাথা অনেক লিখেছি, এবারে গীতিকবিতার কারুণ্যের দিকে ঝুঁকব,' 'বাংলা ভাষার গভীরে যতই প্রবেশ করছি ততই তার নূতন নূতন রহস্য আমার কাছে উন্মোচিত হচ্ছে,' 'একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এসেছে, এ সম্বন্ধে বন্ধু, তোমার কী মত?' ইত্যাদি বাক্যবন্ধযুক্ত ও অনুরূপ ভাবের চিঠিগুলির মধ্যমণি পত্রলেখক নিজে। এই চিঠিগুলি থেকে একটা জিনিসের প্রমাণ হয়। তা হলো এই যে, মধুসূদনের প্রগাঢ় বন্ধুবাৎসল্য ছিল, কিন্তু সেই বন্ধুবৎসলতা একই সঙ্গে তাঁর অহংকে তৃপ্ত করবার একটা মস্তবড় ক্ষেত্র ছিল। বন্ধুদের উপর নির্ভরতা ছিল একাধিক কারণে। ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁর ভিতর যে একাকিত্বের বোধ জেগেছিল সেই একাকিত্বের পীড়ন দূর করবার জন্য যেমন তিনি এককালীন স্বসমাজভুক্ত বন্ধুদের সঙ্গলাভে ব্যগ্র ছিলেন তেমনি সেই সঙ্গ একই কালে তাঁর আত্মাভিমানকে পুষ্ট করে তোলবার একটা চমৎকার উপলক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ মধুসূদনের বেলায় প্রতিটি বন্ধুত্ব ছিল ইংরেজী বাক্যরীতি অনুসরণ করে বলতে পারি তাঁর egoকে ঝুলিয়ে রাখবার এক একটি পেরেক বিশেষ। বন্ধুত্বের তাগিদে বন্ধুত্ব নয় বন্ধুত্বের দর্পণে নিজেকে আরও বিশেষভাবে অনুভব করবার জন্যেই তাঁর ওই বন্ধুনির্ভরতা।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, এই পত্রলেখালেখির ব্যাপারটা প্রায় সবটাই ছিল একতরফা। এই পত্রজগতে ভূমিকা মাত্র একজনারই, আর সকলে নীরব দর্শক মাত্র। বন্ধুদের মধ্যে ধরা যাক রাজনারায়ণ বসু যদি পত্রোত্তরে তাঁর নিজের রচনা-পরিকল্পনা মধুসূদনের কাছে উন্মুক্ত করতে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতেন যে তিনি আপাতত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদেশে উপনিষদের ইংরেজী তর্জমায় নিরত আছেন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই অনুবাদ ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে, মধুসূদন যেন একবারটি সেগুলির উপর চোখ বুলিয়ে তর্জমার গুণাগুণ সম্পর্কে মতামত জানান; তা হলে নিশ্চিত বলতে পারি মধুসূদন সেই অনুরোধ রক্ষা করে রাজনারায়ণকে বাধিত

করতে সামান্যই আগ্রহান্বিত হতেন—ওই প্রস্তাব ঝটিতি ভুলে যাওয়াই ছিল মধুসূদনের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। নিজে যিনি সকলের মনোযোগের কেন্দ্র এবং সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্র, তাঁর কি অপরের প্রতি মনোযোগী হওয়ার অবসর আছে বা উৎসাহ আছে? ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতায়ও অনুরূপ উদাহরণের সন্ধান পাওয়া যায়। আড্ডাতেই হোক বা অন্যবিধ জমায়েতেই হোক, কোন কোন বক্তা আছেন যিনি বন্ধুদের উপর একটানা দীর্ঘ বক্তব্য চাপিয়ে দিতে ক্লান্তি বোধ করেন না কিন্তু বন্ধুদের মধ্য থেকে যেই কেউ সামান্য একটু মুখ খুলতে উদ্যত হয়েছেন অমনি নিজে বক্তার উচ্চপদ থেকে স্খলিত হয়ে অধীনতাজ্ঞাপক শ্রোতৃপদে অবনীত হবার আশংকায় ঝটপট হাই তুলতে বা ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করেন—এও অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার। তফাতের মধ্যে, একটি পত্রীয়, অন্যটি মৌখিক। তবে মধুসূদনের সপক্ষে এই বলা যায় যে, তাঁর ভূমিকাটি একপাক্ষিক হলেও তাঁর ভিত্তি ছিল সুদৃঢ়। তা প্রতিভার বর্মের দ্বারা ছিল সুরক্ষিত। তিনি নিজের সম্পর্কে যে অপরিমেয় আত্মপ্রত্যয় পোষণ করতেন, সেই আত্মপ্রত্যয়ের যৌক্তিকতা তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাঁর সৃষ্টিসমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বহুলাংশে। ('বহুলাংশে' কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। সর্বাংশে নয় এই জন্য যে, তাঁর প্রতিভার ভিতর গোড়া থেকেই যে-আত্মখণ্ডনের সর্বনাশা বীজ লুক্কায়িত ছিল তা তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের প্রতিবন্ধকতা করেছে পদে পদে। শেষের দিকে তো আরও বেশী পরিমাণে। মৃত্যুর পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের কবিজীবন কবির প্রথম বয়সের অপার প্রতিশ্রুতি তথা অনন্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনার ম্লান ছায়া বহন করেছে মাত্র। এ একটা সমুচ্চ কীর্তির ভগ্নদশার প্রায়ান্ধকার গোধূলি কাল।) মাইকেলী আত্মঘোষণ বাহ্বাস্ফোটমাত্র ছিল না, তার মূলে ছিল যুক্তির জোর, কৃতিত্ব গৌরবের জোর, সাফল্যের জোর; এক কথায় সত্যের জোর। মাইকেল দত্তের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বকে বন্ধুরা অবলীলায় মেনে নিয়েছিলেন বলতে পারা যায়।

এইখানে মাইকেলের প্রতিভার স্বরূপলক্ষণ নির্ণয়ের একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে যে-পরিবেশের ভিতর ওই প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছিল তারও একটা পরিমাপন করা চলে।

দশ বছর বয়সে বালক মধুসূদন সাগরদাঁড়ি গ্রাম ছেড়ে পাঠাভ্যাসের উদ্দেশে কলকাতায় আসেন। সেটা ১৮৩৩ সাল। ধনী পিতার অপরিমিত

প্রশ্রয়ে জীবনযাত্রার বাহুল্যের চর্চা আর মায়ের পুণ্য-প্রভাবে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণাদির অনুশীলন—এই দুইয়ে মিলে বালকের মনে মিশ্র মানসিকতার সঞ্চার করেছিল জীবনবিকাশের একেবারে সেই প্রারম্ভিক পর্বেই। একদিকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও বিলাসী অন্যদিকে দেশজ সংস্কৃতির ছায়াস্নিগ্ধ পথ বেয়ে মাঝেমধ্যে জাতীয় সত্তার গহনে দৃষ্টিক্ষেপকারী এক ভাবুক কিশোর। এই বিপরীত দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের সংস্কার আজীবন তাঁকে বহন করতে হয়েছে এক অনতিক্রম্য নিয়তির মত।

যাই হোক, হিন্দু কলেজে যখন তিনি প্রবেশ করলেন তখন কলেজের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ডিরোজীয়দের যুগ অস্তমিত প্রায়, তার জায়গায় দেখা দিয়েছে সাহিত্যের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের নেতৃত্বে এক নূতন পাঠার্থীর দল। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন রাজনৈতিক মনোভাবের দিক দিয়ে ছিলেন টোরী দলের অনুগামী, তবে তাঁর কাব্যানুরাগ ছিল খাঁটি আর সেই কাব্যানুরাগ তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মধুসূদন ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনেরই ছাত্র। রিচার্ডসনের সুন্দর শিক্ষাগুণে ছাত্রের মনে কাব্যের প্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল সহজেই, আর এই কাব্যানুরাগের সূত্র ধরে প্রথমে হিন্দু কলেজে, পরে বিশপস কলেজে পাঠাভ্যাসকালে মধুসূদন একাধিক ধ্রুপদী ইউরোপীয় ভাষার অধিকার অর্জন করেন এবং সেই সব ভাষার মুকুরে তত্তৎ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের সন্দর্শন করেন। এই ভাবেই একে একে তাঁর অধিগত হয় হোমার ভার্জিল ট্যাসো দান্তে শেকসপীয়র মিল্টন বাইরন কীটস প্রমুখ নূতন-পুরাতন পাশ্চাত্য কবিকুলের রচনাবলীর পরিচয়। পরে ফরাসীদেশে বসবাসকালে রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় কবি বোকাচ্চিও ও পেত্রার্কের রচনার সঙ্গে ঘটে নিবিড়তর সান্নিধ্য। এছাড়া সংস্কৃত কাব্যের জ্ঞান তো ছিলই। এইভাবে কাব্যসাহিত্যের সপ্তসিন্ধু মন্থন করে মধুসূদন যৌবনকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই হয়ে উঠেছিলেন এক বিচিত্র কাব্যরসের অভিসারী—নিপুণ বিশ্বনাবিক। নানা কারণে বাংলা ভাষার জ্ঞানটা গোড়ায় কিছু কাঁচা ছিল তবে অন্তর্লীন সংস্কারের মত ওটা প্রতি বাঙালী বালকমনেই থাকে সুপ্ত, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শ ও সংঘাতে এলে জ্বলে ওঠে সহসা। বিশেষত প্রতিভাবানের বেলায় এ কথা তো আরও বেশী করে খাটে। মধুসূদন যখন থেকে সংকল্প করলেন বিদেশী ভাষার কাব্যচর্চা আর নয়, এখন থেকে নিরবচ্ছিন্ন মাতৃভাষাই হবে তাঁর প্রকাশের মাধ্যম, সেইদিন থেকে কর্ণের কবচকুণ্ডলে

মত মাতৃভাষায় তিনি সহজদীক্ষা পেয়ে গেলেন; বাইরের জীবনে যত সাহেবিয়ানা আর উচ্ছৃঙ্খলতাই তিনি করুন না কেন, মায়ের ক্রোড়ে যে ভাষায় মুখের বোল ফুটেছিল অতি শৈশবে, সে ভাষায় নতুন করে অধিকার অর্জনে প্রতিভাবানের আর কতটা সময় লাগে?

এই গেল প্রস্তুতির একটা দিক। সেটাই অবশ্য মুখ্য দিক এবং মধুসূদনকে কবিরূপে প্রতিষ্ঠাদানের মূলে। অন্য দিকটা মধু-জীবনের নিতান্ত বহিরঙ্গের দিক - এই দিকটিতে আছে প্রদর্শনবাদী মনোভাব, বাবুয়ানির মোহ, উৎকট উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়না. সাহেবকুলে সাহেবদেরই একজন হওয়ার বাসনা, অপরিসীম দম্ভ, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি। সংসারে প্রত্যেকেই দোষেগুণে মানুষ, দোষগুণটাকে সামাজিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনরকমে মানিয়ে নিয়ে মানুষ মোটামুটি ভারসাম্য নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হয়—মধুসূদনের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু প্রতিভাই এই ক্ষেত্রে বাদ সেধেছিল - কবির পূর্বোক্ত বহিরঙ্গ দোষগুলি কবির গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাচিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল, আর সত্যিসত্যি কাচিয়ে দিয়েওছিল। আমি প্রবন্ধের গোড়ায় এক জায়গায় বলেছি কীভাবে মধুসূদন কাব্যখ্যাতির শিখরদেশে অধিরূঢ় হবার পর কাব্যকে জীবনের পরিকল্পনা থেকে নস্যাৎ করে ব্যারিস্টার হওয়ার খেয়ালে মেতেছিলেন। ব্যারিস্টার তিনি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ব্রীফলেস ব্যারিস্টার। এদিকে বাণী বীণাপাণির প্রসাদ প্রায় চিরতরে হারিয়েছিলেন। কবির সর্বশেষ সার্থক রচনা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৫), ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে লেখা সনেটগুচ্ছ। সেই তাঁর সর্বশেষ সার্থক রচনা। তারপর যা লিখেছেন · যেমন 'হেক্টর বধ,' 'মায়াকানন' ইত্যাদি সৃষ্টিকর্ম হিসাবে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অর্থাৎ মধুসূদনের একুল-ওকুল দুকুলই গিয়েছিল। এমনটা হতে পারতো না যদি বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ দিকের মধ্যে অন্তত একটা কাজচলা গোছের সামঞ্জস্য তিনি সাধন করে চলতে পারতেন জীবনে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কবির আত্যন্তিক একঝোঁকা প্রবৃত্তির ফলে তাঁর শিল্পী জীবনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

চূড়ান্ত মনোবৃত্তির লোকদের ক্ষেত্রে এইরকমটাই বুঝি হয়। যখন যে নেশায় মশগুল হন তার হদ্দ করে ছাড়েন। তারপরই দেখা দেয় প্রতিক্রিয়া, খোঁয়াড়ি ভাঙার অবসাদ, এবং সেই প্রতিক্রিয়ার টানে একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হন। মধুসূদন যে কবছর নাট্য ও কাব্য রচনায় ব্যাপৃত

ছিলেন তাতে বন্দ হয়ে ছিলেন, মনে হয়েছিল জীবনভোর চলবে তাঁর এই সাধনা, এ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আর তাঁর কোন উপায়ই নেই। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল তাঁর ঝোঁকের বদল হয়েছে, আর ঝোঁকের বদল হতে কবিজীবনের সৃষ্টিসমারোহের প্রাকারটিও যেন এক লহমায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। অনেকখানি বাষ্প একসঙ্গে বেরিয়ে গেলে বেলুনের যেমন চুপসানো দুমড়ানো দশা হয় এও অনেকটা সেই রকম। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত কবিজীবনের এই শেষ কয় বছর পূর্বের সার্থকতার বছরগুলির ভগ্নাস্থি মাত্র

সমালোচকদের মধ্যে একাধিকজন মধুসূদনকে ডিরোজীয়দের উত্তরসূরী রূপে কল্পনা করে আনন্দ পান। এ কথা মনে করার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে? খতিয়ে দেখতে গেলে, ডিরোজীয়দের সঙ্গে মধুসূদনের মিলের চেয়ে অমিলের পরিমাণই বেশী। মিল রয়েছে কিছুটা বাইরের জীবনযাত্রার ধরনে—যথা, সমাজের প্রচলিত নিয়ম ভাঙার উৎসাহে, পানাসক্তিতে, ইত্যাদি—ভিতরের মিল সামান্যই। ডিরোজীয়রা ছিলেন কম বা বেশী মাত্রায় সকলেই যুক্তিবাদী লক আর হিউম প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকদের চিন্তাপ্রভাবে অজ্ঞেয়বাদী ভাবুক, দেশপ্রেমিক, সমাজহিতকামী, নানা প্রশ্নে আন্দোলনকারী ও publicist, তার্কিক। আর মধুসূদন একান্তভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক প্রতিভা, আপনাতে আপনি আচ্ছন্ন, রোমাণ্টিক মনোভাবযুক্ত কবিস্বপ্নে বিভোর, সচরাচর যুক্তিবাদের বিপরীত সরণীতে চলতে অভ্যস্ত, আনুষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসী এক খ্রীশ্চিয়ান, সমাজ আন্দোলনে অনুৎসাহী, সমাজসেবা জাতীয় কাজে বিমুখ। এই নার্সিসাস-ধর্মী প্রতিভাকে কি তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ সরকার, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ সমাজহিতকামী মানুষদের সমসারে ফেলবার জো আছে? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এঁদের কেউই কবি নন, আর মধুসূদন মূলত কবি। বস্তুত কবিত্বই মধুসূদনের গোত্রলক্ষণ, আর শ্রেষ্ঠত্বের অসংশয় নিশানা। স্রষ্টা হিসাবে মধুসূদনের সঙ্গে এঁদের কোন তুলনাই হয় না, পক্ষান্তরে পাণ্ডিত্যে ও মনীষায় মধুসূদন আদৌ এঁদের সমকক্ষ নন। মধুসূদনের অধ্যয়ন কেবলমাত্র কাব্যকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল, আর এঁদের কৌতূহল ছিল বহুমুখী, জিজ্ঞাসা ছিল নানা বিষয়ে ব্যাপ্ত। মধুসূদনের সঙ্গে এঁদের সবচেয়ে বড় যে তফাৎ তা হলো এঁরা সকলেই কর্মিপুরুষ—activist, মধুসূদন কর্মবিমুখ, দিবাস্বপ্ন রচনাকারী,

আপনার প্রেমে আপনি মত্ত। তাঁর একমাত্র কর্মিষ্ঠতার পরিচয় কাব্য রচনায়, অন্যবিধ কাজে প্রবল অনীহা। এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাযুজ্য স্থাপিত হতে পারে এমন কোন সাদৃশ্য লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় না। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও আর ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর শিক্ষক—দুইয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে 'সামান্য' চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা দুরাশা মাত্র।

মধুসূদনের সম্পর্কে আরেকটি কিংবদন্তী হল এই যে, তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ আয়ুধে সজ্জিত হয়ে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং নূতনের জন্য তৃষিতচিত্ত বাঙালী-পাঠকের জগৎ নিঃশেষে জয় করেছিলেন। বাঙালী পাঠকসমাজকে যে তিনি জয় করেছিলেন তাতে আর সন্দেহ কী! তবে সেটা রেনেসাঁসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে করেছিলেন কিনা তা একটা প্রশ্ন হয়েই রইলো। আমার ধারণা মধুসূদন এমনই এক দুর্দমনীয় আত্মকেন্দ্রিক উচ্ছৃংখল প্রতিভা যে, তাঁর এই আত্যন্তিক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসাক্ষিকতাকে রেনেসাঁসই হোক কি অন্য কোন বর্গের সামাজিক ঘটনাই হোক, কোন categoryরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। মধুসূদনের তুলনা মধুসূদন স্বয়ং; যদি মিল খুঁজতেই হয় তো সেই মিল খুঁজতে হবে কার্যপ্রকরণে মিলটনের সঙ্গে, আর জীবনচর্যায় বাইরণের সঙ্গে। তবে সেটাও বহিরঙ্গের মিল, আর সে মিল ব্যক্তি উদাহরণে সীমিত, কোন ভাবের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই বাইরের মিল থেকে সুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। অথচ দেখা যায় ডক্টর শীতাংশু মৈত্র পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের গোত্রলক্ষণের সঙ্গে মধুসূদনের আত্মার আত্মীয়তা প্রমাণ করে একখানা গোটা বইই লিখে ফেলেছেন—'যুগন্ধর মধুসূদন'। শুধু তাই নয়, তিনি মার্কসীয় চিন্তাদর্শনের আলোকে মাইকেলের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস করেছেন। মাইকেলের চরিত্রে যে সব অসঙ্গতি আর পরস্পরবিরোধিতা আছে, কোথায় তিনি মার্কসীয় চিন্তার মাপকাঠিতে সেগুলির সমালোচনা করবেন তা নয়, উল্টে, সেগুলির সমর্থনেই যেন তিনি মার্কসীয় সূত্রসমূহের প্রয়োগ করেছেন, তাঁর প্রতিপাদ্য থেকে এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মার্কসীয় দর্শনকে বিচারক্রিয়ার প্রস্থানভূমি রূপে গ্রহণ করা ভাল কিন্তু অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের সমর্থনে মার্কসীয় বিজ্ঞানের প্রয়োগ হওয়া উচিত নয় এইটেই আমার বিনীত নিবেদন। মধুসূদনচরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা, স্বেচ্ছাচার, আত্মপ্রীতি, ক্ষয় ও অপচয়ের মোহ, লক্ষ্যভ্রষ্টতা, কাঞ্চন ও কাঁচকে তুল্যমূল্য

জ্ঞানের সর্বনাশা প্রবৃত্তি—এ সবের যথাযথ সমালোচনা হলে তবেই মধু-ব্যক্তিত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঠিক চাবিকাঠির হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তা না করে তার বদলে যদি "মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের স্বপ্নভঙ্গ আর হতাশার কাব্যরূপই হলো মেঘনাদবধ কাব্য"—এই রকমের আপ্তবাক্য উদঘোষণের চেষ্টা দেখা যায়, যেমন 'যুগন্ধর মধুসূদন' গ্রন্থে দেখা গেছে, তবে সেটাকে বোধহয় গাজুরী অভিমত ছাড়া আর কিছুই বলবার উপায় থাকে না। ডঃ মৈত্রের ভিতর মধুসূদনের প্রতিটি কাজকে সমর্থন করবার এমনই এক বিচার-অসহ প্রবৃত্তি চোখে পড়ে যে, তিনি মধুসূদনের কোনরূপ সমালোচনা সহ্য করতে নারাজ। যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর প্রসিদ্ধ জীবনীতে মধুসূদনের অমিতাচার, ব্যয়বহুলতা আর অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছেন বলে যোগীন্দ্রনাথের প্রতি শীতাংশুবাবুর কতই না গোঁসা! তিনি যোগীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গীকে নীতিবাদী বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নীতিবাদকে কটাক্ষ করলেই মন্দ ভালতে রূপান্তরিত হয়ে যায় না। মাইকেলের শিল্প-ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হলে তাকে তার ভাল মন্দ নিয়েই বোঝবার চেষ্টা করতে হবে—ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিচ্ছুরণকে যুগধর্মের বিচ্ছুরণ জ্ঞান করে আত্মকেন্দ্রিক প্রতিভাকে সামাজিক প্রতিভার সম্মান দিতে চাইলে, সে চাওয়া গ্রাহ্য না হবারই সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের দুটি মৌলিক লক্ষণ—সৃষ্টির বিস্ফার ও বুদ্ধির মুক্তি। এই দুইয়ের ভিতর প্রথমটি মধুসূদনের শিল্পকর্মে প্রমূর্ত হয়েছে যদিও স্বল্পকালের জন্য মাত্র; দ্বিতীয় লক্ষণটি মধুসূদনে একেবারেই অনুপস্থিত। মধুসূদনের ভাবনাচিন্তা অনুভব ও কল্পনা সবই কাব্যসাহিত্যকে কেন্দ্র করে আলোড়িত হয়েছে, মনন বা মনস্বিতাকে কেন্দ্র করে নয়। ফলে বুদ্ধির মুক্তি' কথাটা সচরাচর আমরা যে অর্থে প্রয়োগ করি সেই অর্থে তা মধুজীবনে সার্থক হতে পারেনি। মাইকেল দার্শনিকতার জগৎ থেকে বহু দূরে ছিলেন। বস্তুত তাঁর মনের ধাত মোটেই দার্শনিকতার অনুকূল ছিল না। তিনি একান্তভাবেই ছিলেন কাব্যঅন্তপ্রাণ 'স্বপ্নিল মানুষ'—ব্যক্তিগতসুখদুঃখ অভাব অভিযোগ বাসনা ও বাসনার ব্যর্থতার আবর্তনে সতত-আবর্তিত এক আত্মনিবিষ্ট ভোগ-বাদী কবি। ক্ষুদ্র অর্থে হয়ত তিনি স্বার্থপর ছিলেন না কিন্তু মহৎ অর্থে স্বার্থপর ছিলেন একথা বলতেই হবে। বিদ্যাসাগর বলুন, বন্ধুগোষ্ঠী বলুন, বা তাঁর নাট্যরচনার পৃষ্ঠপোষক রাজা মহারাজারাই বলুন, সকলেই ছিলেন তাঁর এই মহৎ স্বার্থ সংসাধনের যন্ত্র মাত্র, স্বার্থের প্রয়োজন ফুরলে তাঁদের প্রয়োজনও

শেষ। এমন মানুষের কাছে সামাজিক ভূমিকার মূল্য খুব বেশী নয়। মধুসূদনের যে প্রতিভা, তা 'ভাবয়িত্রী' প্রতিভা 'কারয়িত্রী' প্রতিভা নয়। ভাবয়িত্রী প্রতিভা সৃষ্টিশীলতাকে অবলম্বন করে স্ফূর্তি লাভ করে, মধুসূদনেরও করেছিল; কিন্তু সেখানেও কথা আছে। কাব্যজগতের বাইরে তার সৃষ্টির উদ্যম কখনও সম্প্রসারিত হয়নি, তাঁর কৌতূহলের পারিধি ছিল শোচনীয় রূপে সীমাবদ্ধ।

তার উপর তৎকালীন মূল্যবোধ-অনুযায়ী বনেদিয়ানার ধ্যান-ধারণার দ্বারা ছিলেন তিনি সঞ্চালিত—গণতান্ত্রিক অভীপ্সা তাঁর কল্পনাকে সবেগে নাড়া দিয়েছে এমন প্রমাণ খুব বেশী নেই তাঁর রচনায়। তাঁর কাব্যে বীরত্বের ব্যঞ্জনা আছে, ওজোগুণ আছে, দেশপ্রেমের প্রবল অভিব্যক্তি আছে, (যেমন মেঘনাদবধ কাব্যে) প্রেমিক হৃদয়ের বিরহের তপ্তশ্বাস আছে (যেমন ব্রজাঙ্গনা কাব্যে); নিজেই তিনি যে শ্রেণীতে পড়েন সেই শিক্ষিত ইঙ্গবঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ভ্রষ্টাচারের উপর নির্মম ব্যঙ্গ আছে (যেমন একেই কি বলে সভ্যতা? প্রহসনে) কিন্তু গণতান্ত্রিক চেতনার অভিব্যক্তি বিশেষ নেই। ব্যতিক্রম শুধু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি। এখানে তিনি নিপীড়িত কৃষক হানিফ গাজীর চরিত্র সৃষ্টি করে বাংলা নাটকে গণতান্ত্রিকতার নান্দী গেয়েছেন। কিন্তু সেখানেই আরম্ভ সেখানেই শেষ। কৃত্রিম আভিজাত্য আর উচ্চবিত্তের তৎকালীন সমাজে এর চেয়ে স্পষ্টতর গনতান্ত্রিক অভিব্যক্তি বোধহয় সম্ভব ছিল না। অন্তত মধুসূদনে যে সম্ভব ছিল না, তা মধুসূদনের শিল্পী-চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে। বাইরণীয় বোহেনীয় আদর্শের অনুগামী ভোগসুখপরায়ণ অমিতাচারী আত্মকেন্দ্রিক কবির রোমান্টিক কল্পনাচারিতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শ ঠিক মিশ খায় না—তেলের সঙ্গে জলের প্রাবচনিক অসম্ভাবের মতই বোধ করি ওই দুটি বস্তুর ভেদ।

এতক্ষণ মধুসূদনের বিষয়ে যে আলোচনা করা হল, বুঝতে পারছি তাতে সমালোচনার ভাগটাই বেশী প্রকট হয়েছে, গুণবিচারের দিকটাকে তেমন জোরালো করে তুলতে পারা যায়নি। এজন্য আমি স্বতঃই কুণ্ঠিত। কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি যে, এটি মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সন্দর্শনমূলক নিবন্ধ, তাঁর কাব্যকৃতির আলোচনামূলক নিবন্ধ নয়। সৃষ্টির ক্ষেত্র এক আর স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্র আর। দুইয়ের ভিতর নিশ্চয়ই যদিও নিগূঢ় যোগ রয়েছে তবে দুইকে সমীকৃত করা বোধহয় উচিত হয় না। দুইকে

পুরোপুরি এক করবার চেষ্টা করলে ফল তার শুভ না হওয়াই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির দোষ কাব্যে গিয়ে বর্তায়, কাব্যের গুণ ব্যক্তিতে অর্শায়। তেমন বিচারভ্রান্তি থেকে সর্বদা শত হস্ত দূরে থাকবার চেষ্টা করাই ভাল।

মধুসূদন বাংলা ভাষায় এক অসামান্য কবি। তাঁর সবচেয়ে বড় দান বাংলা ভাষার ঋজুতা সাধন, বাংলা কবিতায় পুতুপুতু-নমনীয় কমনীয় ভাবটিকে দূর করে তার জায়গায় দার্ঢ্যের পথ ধরেই তাঁর কাব্যে এসেছে ধ্বনিগাম্ভীর্য -সমুদ্রকল্লোলের প্রস্বন। দ্বিতীয় প্রধান দান একাধিক ক্ষেত্রে তাঁর পাথিকৃত্য—চার চারটি সৃষ্টির বিভাগে তিনি বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের সংযোজনা করেছিলেন। (১) তিনি বাংলায় বিয়োগান্তে নাটকের প্রবর্তক (২) তিনি প্রহসনের সূচনাকারী, (৩) তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবয়িতা; সর্বোপরি (৪) তিনি বাংলা সনেটের জনক। এই চতুর্বিধ পাথিকৃত্য তাঁকে এক বিপ্লবী স্রষ্টার ভূমিকায় সমাসীন করেছে। যদিও সঙ্গে সঙ্গে এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, তাঁর এই চারটি অভিনবত্বের প্রয়াসই অনুকরণাত্মক—মৌলিক নয়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষায় তাঁর এই নূতনত্ব সৃষ্টির প্রেরণাস্থল।

যাই হোক, এর বেশী আর এই প্রবন্ধে মধুসূদনের কাব্যকৃতি সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বিচারকে কাব্যবিচারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা সমীচীন হবে না।

মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা বিহিত হলে তবেই সে শিক্ষা যথার্থ শিক্ষানামবাচ্য হতে পারে, নচেৎ নয়। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিষ্পন্ন হওয়ার ঘটনা কিছু অপরিচিত ঘটনা নয়, আমাদের দেশেই তার জ্বলজ্যান্ত নজির আছে, বিশেষত উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় বিদেশী ভাষার মধ্যস্থতা আজও একটা অকাট্য সত্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই নিয়ম, এখনও পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে ইংরেজির দর ও কদর সমান অব্যাহত রয়েছে। স্নাতকোত্তর স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষা বাংলা ধীরে ধীরে প্রবেশাধিকার লাভ করছে ঠিক কথা, কিন্তু ইংরেজিকে হটিয়ে তার জায়গায় মাতৃভাষা বাংলার অসপত্ন সাম্রাজ্য বিস্তার এখনও অনেক দূরের স্বপ্ন।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষাগ্রহণ রীতির বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই যে, এই শিক্ষার রঙ মনের ভিতর কখনও পাকা হয়ে উঠতে পারে না। যেহেতু ভাষাটা বিদেশী এবং তার অনুষঙ্গ বা পরিবেশটাও আবাল্য পরিচিত নয়, চেষ্টার দ্বারা আয়ত্তীকৃত; সেই কারণেই বিশেষ করে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নিষ্পন্ন শিক্ষায় ভাবের সঙ্গে ভাষার মেলবন্ধন কখনও পুরোপুরি মজবুত হয় না, দুইয়ের মিলনের জোড়গুলির গাঁথুনি কোথাও না কোথাও আলগা থেকেই যায়।

আমাদের দেশে ইংরেজির চলন, ইংরেজির কথাটাই বলি। ইংরেজি শিখতেই শিক্ষার্থীর বারো আনা উদাম চলে যায়, ফলে ভাব অন্তরস্থ করবার মোটে অবসর মেলে না। একজন শিক্ষার্থী যখন শিক্ষাজীবন অন্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, প্রায়শই দেখা যায় তার চিন্তা আধা-খেঁচড়া হয়ে আছে, ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল নেই, ভাষাও যেটা শেখা হয়েছে তা কৃত্রিম উপায়ে, পরিবেশের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগরহিত – আর আনন্দশূন্যভাবে শেখা হয়েছে বলে তা প্রাণের ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি, বহিরঙ্গ কাজ-কারবারেই শুধু তার স্থান হয়েছে। এ ভাষার সঙ্গে দেশের মানুষের যোগ নেই, দেশের ঐতিহ্যের যোগ নেই। দেশের কোনকিছুরই যোগ নেই। আদালতের ধরাচুড়া আদালতেই মানায়, এ ভাষার দশাও তা-ই।

কৃত্রিম সাজ ঘুচিয়ে ফেলে স্বাভাবিক পোশাক পরায় যেমন ঘরে ফেরার আনন্দ পূর্ণতর হয়, তেমনি পোশাকী ভাষার খোলস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাতৃভাষায় প্রিয় বাসটি অঙ্গে ধারণ করতে পারলে আর স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশী ভাষার স্বারস্থ হওয়া মানেই পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ করা—কি সমাজ জীবনে কি অন্যাবিধ কার্যের ক্ষেত্রে।

মাতৃভাষাকে যদি সর্বস্তরের শিক্ষার বাহন করা যায় তাহলে উপরে বর্ণিত অনেক অসুবিধার কবল থেকে তো রক্ষা পাওয়া যায়ই, সুবিধাও ঘটে বিস্তর। সুবিধাগুলি মৌলিক। প্রথমত, মাতৃভাষার শিক্ষায় স্বাভাবিকতার কোল থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। মাতৃস্তন্যলালিত ভাষা গোড়া থেকেই শিক্ষার ভাষা হওয়ায় মানসিক বিকাশের ক্রমটি অবিচ্ছিন্ন থাকে, ধারা-বাহিকতায় কোথাও ছেদ ঘটে না। তদুপরি আনন্দ এসে শিক্ষার হাত ধরে দুস্টিতে সহযাত্রী হয়ে পথ চলে। আনন্দবর্জিত শিক্ষা শিক্ষাই নয়, বিশেষত শিক্ষার্থীর গোড়াকার পর্বগুলিতে।

মাতৃভাষায় শিক্ষায় আনন্দ কেন? আনন্দ এই জন্য যে মাতৃভাষায় আত্মীয়তার প্রতিশ্রুতি ষোল-আনা পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্যে রক্ষিত, সর্বোপরি অপরিচয়জনিত অস্বাচ্ছন্দ্য এখানে অনুপস্থিত। চারিদিকের আব-হাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যে এবং ব্যাকরণ অভিধান ইত্যাদির বন্ধন থেকে কমবেশী মুক্তির নিশ্চয়তায় শিক্ষালাভের প্রক্রিয়াটা হয়ে ওঠে অনায়াস মসৃণ, কাজেই স্ফুর্তিযুক্ত। ভাবের কথা পরে, ভাষা শিখতেই বিদেশী ভাষার বেলায় যে গলদ-ঘর্ম পরিশ্রমের বাধ্যবাধকতা, মাতৃভাষায় তার সিকির সিকি শ্রমও করতে হয় না। তার মানে এ নয় যে মাতৃভাষা শিক্ষায় যত্ন ও নিষ্ঠার আবশ্যকতা নেই। আবশ্যকতা বিলক্ষণমাত্রায় আছে, তবে এ আবশ্যকতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বতঃ-স্ফূর্ত, ফলে তার আনন্দের ভাগে কখনও কমতি পড়ার জো থাকে না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের একেবারে শুরুর পর্ব থেকেই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেই বাঙালী বালক বালিকাদের ইংরেজি ভাষায় লেখাপড়া শেখা নোর চেষ্টার সমূহ অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তখন থেকেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে আসছিলেন। কিন্তু তখন কবির কথায় কেউ তেমন কর্ণপাত করেনি। ইংরেজি শিক্ষাভিমানী মহল বহুলাংশে বিজাতীয়তার মোহে এবং কতকটা শ্রেণী স্বার্থের গরজে ইংরেজিকেই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বকার্যে একমেবা-দ্বিতীয়ম ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। কি শিক্ষায় কি রাজনীতিতে

আন্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ইংরেজিরই জয়জয়কার ছিল। আজ অনেক ভুলের অভিজ্ঞতার পর এবং ঠেকে শিখে আমরা বুঝতে পারছি কবির কথা কত দূরদৃষ্টি প্রসূত ছিল। সেই সময়ে যদি দেশের শিক্ষাবিধায়কেরা এবং রাষ্ট্রনায়কেরা কবির পরামর্শ শুনে নিজ নিজ অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিতেন তাহলে দেশের চেহারা আজ অন্যরকম হত। অন্তত এটা তো নিশ্চয় যে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীর কাল আর আজকের কালের মধ্যে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে সংঘটিত পর্বতপ্রমাণ অপচয় ক্ষয়-ক্ষতি ও অবিমৃষ্যকারিতার ভুল নিবারিত হতে পারত। আমরা সময় থাকতে সময়ের কাজ করি না, তা যদি করতুম তো আজ বিগত দিনের ভুলভ্রান্তি নিয়ে আক্ষেপ করবার প্রয়োজন হত না।

রবীন্দ্রনাথ ঊনিশ শতকের শেষ দিকে 'শিক্ষার হেরফের' ও 'শিক্ষার বাহন' নামক দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন! দুটি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান রীতির প্রশস্ততা ও বিদেশী ভাষায় এই কার্য করতে যাওয়ার অনুপযোগিতা ও অপকারিতা প্রতিপাদন। একাধিক অপ্রতিবাদ্য যুক্তিযোগে তিনি এই দুই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করেছিলেন। শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটি লেখা হয় সাধনার যুগে, ১২৯৯ সালে। শিক্ষার বাহনও তা-ই। পরে এই দুই প্রবন্ধ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে লিখিত জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধের সমবায়ে 'শিক্ষা'গ্রন্থটির প্রচার হয়। এগুলির ভিতর প্রথম দুটি প্রবন্ধই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে—'শিক্ষা সমস্যা' "জাতীয় বিদ্যালয়" 'আবরণ" প্রভৃতি।

ইংরেজি ভাষার সাহায্যে বালকবালিকাদের শিক্ষাদান চেষ্টার কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আক্ষেপ প্রকাশ করে লিখছেন—'বিধির বিপাকে বাঙালি ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।...তাহার ফল হয় এই যে হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনিই পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি, এ, এম, এ, পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনো মতে কাজ চলে মাত্র। কিন্তু বিকাশলাভ হয় না।"

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার কুফল বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন—"বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আঠা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রং মাখিয়া উলকি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে।"

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্গতির কারণগুলি নিয়ে কবি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কবি লিখছেন,—"এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়—গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না।"

মাতৃভাষার প্রতি কবির ভালবাসা কত গভীর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ওই একই প্রবন্ধের নিচের দুটি উদ্ধৃতিতে। কবি বলেছেন—

"মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?"

কিংবা,

"ভালোমতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাহার শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকে আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না? ...বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?"

মাতৃভাষার অনাদরে শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, সাহিত্যও যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি কবলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই অপচয়ের দিকটাকে তুলে ধরেছেন একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে—"এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ, আমরা নিজের ভাষায় রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপুর্তি করে না।"

কবিগুরু বাঙালির মাতৃভাষার প্রতি অনাদর আর উৎকট ইংরেজি-প্রীতিকে বারে বারেই কঠিন আঘাত হেনেছেন এবং এর ফল জাতীয় জীবনে কী বিষময় ফল প্রসব করতে চলেছে সে বিষয়ও দেশবাসীকে সর্বদা সচেতন করে দিতে চেয়েছেন। 'শিক্ষা' গ্রন্থের 'শিক্ষা সংস্কার' প্রবন্ধে তিনি আয়ার-ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলেছেন, বাঙালি যদি সময় থাকতে সচেতন না হয় তাহলে তারও আয়ারল্যান্ডবাসীর দশা হবে। আয়ারল্যাণ্ডের মাতৃভাষা কেল্টিক, সে ভাষাকে জোর করে দাবিয়ে ইংরেজ সেখানে ইংরেজি চালানোর চেষ্টা করে। আয়ারল্যাণ্ডবাসীরা স্বভাবতই জাতীয় ভাবের গভীর অনুরাগী, ফলে তাদের কাছে এই জবরদস্তি অত্যন্ত দুঃসহ ঠেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী ভাষানীতি থেকে একচুল বিচ্যুত হয়নি, ছলে বলে কৌশলে আয়ারল্যাণ্ডের লোকদের ইংরেজি গিলতে বাধ্য করে। ইংরেজ এ কাজে এক ঢিলে দু' পাখি মারতে চেয়েছিল—আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় ভাষা দলনের সঙ্গে সঙ্গে তার জাতীয় ভাবকেও পিষে মারবার ফন্দি এঁটেছিল। বাংলা-দেশেও ইংরেজ তাদের আমলে ঠিক একই নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তারই বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সময় থাকতে সচেতন হবার পরামর্শ দিয়েছেন এই প্রবন্ধে।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও গ্রহণের আদর্শ রবীন্দ্র-জীবনে নিছক একটি তত্ত্বের ব্যাপার ছিল না, তাকে তিনি কার্যকর জীবন্ত রূপ দিতেও বারবার সচেষ্ট ছিলেন। কবিস্থাপিত শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষাদান প্রণালীই তার প্রমাণ। সেখানে মাতৃভাষার ছিল অপ্রতিহত প্রাধান্য। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক জীবনেও বাংলা ভাষার সমাদর ছিল প্রভূত এবং পরিবারের সব কাজে বাংলাকে স্বতই অগ্রাধিকার দেওয়া হত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাংলা-প্রীতি

এতই অসামান্য ছিল যে, শোনা যায় বাঙালি হয়ে কেউ তাঁকে ইংরেজিতে চিঠি লিখলে সে-চিঠির উত্তর তিনি দিতেন না। স্বীয় সহজাত সংস্কার ছাড়াও কবি বাংলা ভাষার প্রতি এই মমত্ব পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ করেছিলেন। যে-কালে রাজনৈতিক সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা কেউ কল্পনা করতে পারত না, সেইকালে রবীন্দ্রনাথ নাটোর জাতীয় কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলায় লিখিত ভাষণ পাঠ করে সমাগত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনে চমকের সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজিতে তিনি ভাষণ দিতে পারতেন না তা নয়, দেশের রাষ্ট্রনীতির মঞ্চে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বাংলার বুকের উপরে সভা বসেছে অথচ তার সমস্ত কাজকর্ম চলেছে ইংরেজিতে—এ তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যই তাঁর এই মাতৃভাষায় বক্তৃতা দান। পাথিকৃত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন ছাড়াও এ কাজের পেছনে যে-প্রচণ্ড রকমের নির্ভীকতার দ্যোতনা ছিল, তার কথাও ভেবে দেখবার মত।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন মাতৃভাষার সাধনায় উৎসর্গীকৃত। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষায় মর্যাদার স্বীকৃতি সেই সাধনার পরিণামফল। আরও একাধিক দিক্‌পাল বাঙালি লেখকের অবদানও এই ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু একা রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তার তুলনা নেই। মাতৃভাষা বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একক ভূমিকার বিশালত্ব ও মহত্ত্ব চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

কিন্তু শুধুমাত্র স্মরণে রাখলেই বুঝি আমাদের কর্তব্য নিঃশেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা সম্পর্কিত চিন্তা আমরা বাস্তব জীবনে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কতটা কী-পরিমাণ প্রয়োগ করতে পেরেছি তারই উপরে আমাদের কর্তব্য-চেতনার গভীরতা-অগভীরতার তারতম্য নির্ভর করছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের সময়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ-নির্দেশের মূল্যবত্তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি, পরেও যে তাঁর কথায় যথোচিত কর্ণপাত করেছি তার বিশেষ কোন প্রমাণ নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন এই শতকের একেবারে গোড়া দিকে, দু-একটি তারও আগে, অথচ দেখা যায় দেশ স্বাধীন হওয়ার কাল পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রসঙ্গটি আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গের হাতে বরাবরই উপেক্ষিত থেকে গেছে কম বা বেশী পরিমাণে। শান্তিনিকেতনে ছাড়া আর বিশেষ কোথাও কবির আদর্শ অনুযায়ী মাতৃভাষাকে

শিক্ষাদানকার্যের কেন্দ্রস্থ বিষয় করার চেষ্টা দেখা যায়নি। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র পঠনীয় বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে তাকে জাতে তোলা হয়, কিন্তু আর সব স্তরের পঠন-পাঠন পূর্বের মত ইংরেজিতেই চলতে থাকে যথারীতি। অবিভক্ত বঙ্গে মাতৃভাষা বাংলার যতটুকু যা কদর দেখতে পাই তার সবটাই বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তা তেমন দাগ ফেলতে পারেনি। সাহিত্যে বাংলা ভাষা রাজপাটে সমাসীন হলেও অন্যত্র তার ভাগ্য ঘুটেকুড়োনী দাসীর ভাগ্য অপেক্ষা অধিক স্পৃহণীয় ছিল না।

সেই ট্রাডিশনই সমানে চলেছিল এই সেদিন পর্যন্ত। মাত্র কিছুকাল হল ওই অনুচিত ব্যবস্থার রদবদল হতে চলেছে। কংগ্রেস সরকার মুখে মাতৃ-ভাষার জয়মহিমা কবুল করলেও কার্যত আঞ্চলিক ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিশেষ কিছুই করেনি—একমাত্র হিন্দীভাষাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দান এবং হিন্দীর অনুকূলে গোটা প্রচার-সৌভাগ্যের ডালাটি উপুড় করে ঢেলে দেওয়া ছাড়া। অন্যদিকে ইংরেজির আরও রবরবা ঘটেছে কংগ্রেসের বিগত তিরিশ বছরের শাসন আমলে। পশ্চিমবাংলার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, আটচল্লিশ সাল থেকে সাতাত্তর সালের মধ্যে কলকাতায় এবং তার আশেপাশে ব্যাঙের ছাতার মত ইংলিশ মীডিয়াম স্কুল কত যে গজিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। সবাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজির ছাপ-মারা কেতাদুরস্ত শিক্ষা দিতে চান, মাতৃভাষাশ্রিত জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁদের সন্তানেরা মানুষ হয়ে উঠুক এটা তাঁদের পছন্দ নয়। ইংরেজি স্কুলে পড়াতে গিয়ে মধ্যবিত্ত-নিম্ন-মধ্যবিত্ত অভিভাবক ঘটিবাটি বন্ধক রাখতে পর্যন্ত প্রস্তুত, তবু বাংলা স্কুলের ধার দিয়েও যাবেন না। এমনি তাঁদের ইংরেজি-প্রীতি।

ইংরেজির প্রতি এমনতর আত্যন্তিক মোহ জাতীয় জীবনের সুস্থ অগ্রগতির পক্ষে সর্বনাশা না হয়েই যায় না। কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই একটা বিদেশী ভাষাকে নিয়ে এজাতীয় হ্যাংলামির আদিখ্যেতা দেখা যায় না। মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশী ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য, এর আর চারা নেই। এই ক্ষতিটা হয়ত সব সময় সাদা চোখে দেখা যায় না বা আশু দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে তার কুফল অনুভূত হতে থাকে। কুফল কত রকমের হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সেটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তার বিপদ সম্পর্কে সময় থাকতে দেশবাসীকে সতর্ক করে

দিয়েছিলেন। অনেক ভুলের মাশুল গুণে এবং অনেক ঠেকে শিখে আজ তাঁর কথার গুরুত্ব আমরা একটু একটু করে উপলব্ধি করতে পারছি।

বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলার সমস্ত স্কুল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি তুলে দিয়েছেন। এখন থেকে এই পর্যায়ের তাবৎ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই নিষ্পন্ন হবে। ফ্রন্ট কমিটির এই সিদ্ধান্ত অতিশয় সময়োচিত ও সুসংগত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী বালকবালিকাদের মাতৃভাষার উপর আর একটি ভাষা (তাও বিদেশী ভাষা) শিক্ষার চেষ্টায় সময় ও উদ্যম এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করার কোন মানে হয় না। শিখতে হলে তার জন্যে পরে অঢেল সময় পড়ে রয়েছে, শুরুতেই বিদেশী ভাষার জোয়াল কাঁধে চাপিয়ে তাদের গতি মন্থর, অন্তর নিরানন্দ করা কেন? গাঁয়ের চাষীর ছেলে মেয়ে, প্রাইমারী স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে যাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, তাদের জীবনে ইংরেজির ভূমিকা কতটুকু? এবং থাকলেও তার মূল্য কতটা? তাদের মধ্যে কয়জনা পরবর্তী জীবনে ইংরেজি শেখার সুযোগ পাবার আশা করতে পারে? গোড়াগুড়ি ইংরেজি ভাষা মকশ করে তাদের কোন্ চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে? কৃষিকাজের ছকের মধ্যে যে-ভাষাব ব্যবহারিক মূল্য কানাকড়িও নয় অথবা যৎসামান্য সে-ভাষা শেখবার জন্য শুরু থেকেই ছেলেমেয়েদের আদাজল খেয়ে লাগতে বলা তাদের উপর অত্যাচারের শামিল।

কিন্তু যেরকমটা ভাবা গিয়েছিল তা-ই ঘটেছে। ইংরেজির বাতিকওয়ালা-দের কাছ থেকে ফ্রন্ট সরকারের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছে। তাঁদের সাধের ইংরেজি মাঠে মারা পড়বার উপক্রম হতে তাঁরা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে আরম্ভ করেছেন। ইংরেজিই যদি শিক্ষার পরিকল্পনা থেকে ছাঁটাই হয়ে গেল তো আর রইল কী। ইংরেজির কৌলীন্য কি মাতৃভাষাকে আদৌ দেওয়া চলে? এতকাল যে সুয়োরানী রাজার অঙ্ক অধিকার করে সমস্ত সুখৈশ্বর্য একা ভোগ করেছিল তাকে সেখান থেকে হটিয়ে কুঁড়েঘর থেকে দুয়োরানীকে ডেকে এনে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে কোন্ সুবিধাভোগীর দল তা বিনা বাধায় মেনে নিতে পারে? সুতরাং প্রত্যাশিতভাবেই ইংরেজি-নবীশদের তরফে শোরগোল উঠেছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু ইংরেজিওয়ালাদের একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না। তাঁরা তো প্রায় সবাই উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ, শহরে-বন্দরে তাঁদের বাস। কিন্তু দেশটা শুধুই উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত দিয়ে গড়া নয়, শহুরে মানুষ সমগ্র দেশবাসীর ভগ্নাংশ মাত্র। অগণিত মানুষ পশ্চিমবাংলার গ্রামে বাস করে এবং তাদের

ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন পূরণার্থেই বামফ্রন্ট সরকারের নয়া শিক্ষানীতির পরিকল্পনা ও প্রয়োগ। মাতৃভাষাকে এইজন্যই শিক্ষানীতির একেবারে কেন্দ্রমধ্যে এনে বসানো হয়েছে, তাকে সঠিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র শহুরে লোকদের স্বার্থে শিক্ষা পরিচালনার দিন অপগত হয়েছে, শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সেটা করতে হবে এবং সেই পথেই এখন শিক্ষানীতির মোড় ঘোরানো হয়েছে।

কবির স্বপ্ন এতদিনে বুঝি সত্যি সত্যি সফল হতে চলল।

রবীন্দ্র-মূল্যায়নে নূতন দৃষ্টিকোণ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের মূল্যায়নে এতাবৎ ভাববাদী দৃষ্টিকোণেরই সর্বাধিক প্রয়োগ হতে আমরা দেখেছি। তাঁকে উপনিষদের সন্তান, বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদের উদ্‌গাতা, আনন্দবাদের উপাসক প্রভৃতি বর্ণনায় বিভূষিত করে তাঁর প্রতিভার একটি একাঙ্গী ধারণাই জনমনে সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছে বেশী। সেই তুলনায় তাঁর কাব্য সাহিত্যের যেটা মানবমহিমার দিক, জীবন-প্রীতির দিক, বস্তুবিশ্বের বিবিধ সৌন্দর্যের প্রতি আত্মহারা মুগ্ধতার দিক—সেই দিকটায় জোর পড়েনি। আমাদের সমালোচকদের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে সনাতন ভারতীয় মানসিকতা-প্রসূত যে-ঐতিহ্যমুখী ভাববাদী প্রবণতা রয়েছে তারই প্রতিফলন গিয়ে পড়েছে রবীন্দ্র-কাব্যের মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার উপর এবং তার ফলে রবীন্দ্র-কাব্য স্বরূপতঃ যা নয় তেমনি চেহারায় তা প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকারেরা প্রায়শঃ নিজ নিজ রুচি ও প্রবণতার রঙে রাঙিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন। এবং বলাই বাহুল্য যে, এই মজ্জাগত জীবনবিমুখতার দেশে মানুষের রুচি-পছন্দটা সহজেই অধ্যাত্মবাদ, অতীন্দ্রিয়তা, মরমীবাদ ও বৈরাগ্যের দিকে ঝোঁকে এবং সমালোচক শ্রেণীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নন!

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবধারায় গভীরভাবে নিস্নাত ছিলেন সে কথায় সন্দেহ করবার কারণ নেই কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ব্রহ্মবাদই একমাত্র বস্তু, যা তাঁর জীবনের সকল ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ব্রহ্মবাদেরও আবার নানা মত নানা বিশ্লেষণ। ব্রহ্মবাদ বলতে যদি কেবলমাত্র ঈশ্বরচৈতন্যই বোঝায়, এবং ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত আর সব-কিছুর প্রতি পরম ঔদাস্য সূচিত করে; তবে তেমন ব্রহ্ম-বাদের প্রতি কবির বিশেষ কোন আসক্তি ছিল না। আর যাই হোক তিনি বৈদান্তিক মায়াবাদের পরিপোষক ছিলেন না। উপনিষদীয় চিন্তায় কর্ষিত তাঁর মন ঐশী ধ্যান-ধারণার প্রতি স্বতই আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু এই আকর্ষণ জগৎ-সংসারের প্রতি পিঠ দিয়ে থেকে নয়, কবির কাব্য-কল্পনার বলয়ের ভিতর ব্রহ্ম এবং মর্ত্য পৃথিবী দুইয়েরই সমান স্থান ছিল এবং দুই-ই তাঁকে সমানভাবে টেনেছে—কখনও যুগপৎ, কখনও একান্তরক্রমে।

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নিশ্চিত আমরা দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বলতে পারি।

এক্ষেত্রে বৈদান্তিকদের অপেক্ষা বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁর ভাবের মিল ছিল অনেক, অনেক বেশী। অথচ ভুল করে তাঁকে প্রায়ই বেদান্তের ব্রহ্মকৈবল্য তত্ত্বের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী করে আঁকা হয় এবং ওই সূত্রে 'ঋষি' 'ক্রান্তদর্শী' 'ত্রিকালজ্ঞ' ইত্যাদি ধরনের কত-না অভিধা তাঁর উপর আরোপ করা হয়। এই সব বিশেষণ শ্রুতিমধুর হলেও কবির ব্যক্তিত্বে সেগুলি আরোপিত হওয়ার বিপদ এখানে যে, তার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। এসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা কবির ভাগবত তন্ময়তার ভাবটি অবশ্যই পাই আর সে পরিচয় কিছু বেঠিকও নয়, কিন্তু যে-পরিচয়টি এর ফলে আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে যায় তা হলো তাঁর জীবনরসের রসিক রূপ, পৃথিবীর বিচিত্রসৌন্দর্য উপভোক্তার রূপ, মানুষের মাহাত্ম্যকীর্তনকারী রূপ। আবাল্য সৌন্দর্যের পূজারী এই কবি কোনদিনই বৈরাগ্যের তন্ত্রে নিজেকে আকৃষ্ট বোধ করেননি, বরাবর এই সুন্দর ভুবনে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন, এবং এই জগৎ-সংসারে যা দেখেছেন যা পেয়েছেন. কখনোই তার তুলনা খুঁজে পাননি। বেদান্ত-সুলভ শুষ্ক মায়াবাদীর মনোভঙ্গী থেকে এ মনোভঙ্গীর দূরত্ব সুদূরতম বললেও চলে। দীর্ঘ দিনের ভাবানুষঙ্গের ফলে ঋষি বললেই এদেশীয় মানুষের চোখে অদ্বৈতপন্থী এক সংসারবিবাগী ভাবুকের ছবি ভেসে ওঠে কিন্তু ওই ছবির ফ্রেম কবির ব্যক্তিত্বে আঁটাতে গেলেই মুশকিল।

তবে সত্যের খাতিরে বলতেই হয় যে কবির প্রথম ও মধ্য বয়সের রচনায় তাঁর সৌন্দর্যসচেতন রূপতান্ত্রিক জীবনপ্রেমীর রূপটি যত ফুটেছে তাঁর মানবপ্রেমী রূপটি তত ফোটেনি। 'কড়ি ও কোমল,' 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'খেয়া', 'চৈতালী', 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি কাব্যের এবং প্রথম দিককার একাধিক গীতিনাট্যে একজন সৌন্দর্যতন্ময় নিসর্গভাবুক বাঁচার আনন্দের আবেশমুগ্ধ কবিকেই যেন সব ছাড়িয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখতে পাই। এদিকে তাঁর ঐশী চেতনা-মণ্ডিত ভগবদ্ ভক্তের রূপটি ফুটেছে প্রধানতঃ 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ দুটির মধ্যে আর তাঁর পূজা পর্যায়ের অজস্র গানগুলির ভিতরে। সেই সঙ্গে গদ্যগ্রন্থের হিসাব ধরলে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালাকেও এর সঙ্গে যোগ করতে হয়। কিন্তু এ সবের কোন একটিতেই তাঁর মানবতাবাদী রূপটি তেমন প্রকট নয়।একবার মধ্যবয়সে 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তাঁর প্রকৃতি সচেতনতা ও ঐশী ভাবুকতার দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্শ্বপরিবর্তন ঘটিয়ে কবির সংবেদনশীল চিত্তে সাধারণ মানুষের দুঃখে গভীর সমবেদনার আর্তি জেগে উঠেছিল। আর একবার 'গীতাঞ্জলি'র কিছু কবিতায় ও গানে

এই দুর্ভাগা দেশের অপমানাহত অত্যাচারিত পীড়িত জনদের জন্য কবির সহানুভূতিদ্রব অন্তরের ক্রন্দনরত রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তার পরেই আবার কবিকে প্রকৃতিপ্রেমে ও ঈশ্বর-প্রেমে ফিরে যেতে দেখি। যে-কোন কারণেই হোক কবি-জীবনের পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে কবি-সত্তায় মানবতার আবেশ স্থায়ী হয়নি। 'বলাকা' ও 'পূরবী' কাব্যে অবশ্য প্রকৃতি-নিরপেক্ষ ঈশ্বর নিরপেক্ষ ভিন্নতর সুর লেগেছে কিন্তু সে সুর মানবিকতার সুর নয়। বলাকা র মূল উপজীব্য বস্তুবিশ্বের গতিচঞ্চলতা, দার্শনিকতা তার মর্মে; আর পূরবীর সুরে পাই বিষণ্ণতার কারুণ্যের আবেশ। সান্ধ্য আকাশের অস্তরাগের রঙে ওই কাব্য-টির আকাশ বিধুর। কিন্তু তার ভিতর মানবতার রঙ খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে।

অথচ কবির উত্তর-জীবনের কাব্য কবিতায় নাটকে প্রবন্ধে ভাষণে মানবতার একেবারে ছড়াছড়ি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'পুনশ্চ' (ক্যামেলিয়া, ছেলেটা, সাধারণ মেয়ে প্রভৃতি কবিতা দ্রষ্টব্য) থেকে তাঁর যে নূতন কাব্যযাত্রার শুরু হয়েছে তাতে ঈশ্বরচেতনা তথা প্রকৃতিপ্রেম ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে এসেছে, পক্ষান্তরে মানবিকতা উত্তরোত্তর সোচ্চার হয়েছে। তখন কবির বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। সমালোচকদের একাংশের মত এই যে ঈশ্বর-চেতনা এই পর্বের রচনায় শুধু যে কমে এসেছে তাই নয়, তার বদলে এক ধরনের অজ্ঞেয়বাদ বা প্রহেলিকা-বোধ এসে তার জায়গা জুড়ে বসেছে। এই মত পুরোপুরি সত্য নাও হতে পারে তবে কথা এই যে, কবির রচনায় আর এই অধ্যায়ে পূর্বেকার অধ্যাত্মবাদী ধ্রুব প্রত্যয়ের সুরটি পাইনে। ইতোমধ্যে কী যেন ঘটে গেছে যাতে করে তাঁর প্রথম বয়সের উপনিষদীয় সুদৃঢ় সংস্কারের ভিতে চিড় ধরেছে, ভাগবত বিশ্বাস টলে গেছে। এমনকি প্রকৃতিসন্দর্শনেও আর আগের আত্মহারা ভাবটি নেই।

কী এমন ঘটলো যাতে কবির মানসিকতার এই লক্ষণীয় পরিবর্তন? রবীন্দ্র-তত্ত্বজ্ঞদের ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতাই কবির ভাবজীবনের এই রূপান্তরের মূল। একে নিছক রূপান্তর নয়, গোত্রান্তরও বলা চলে। কবির প্রথম জীবন লালিত হয়েছিল বুর্জোয়া জীবনযাত্রার সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত অমিত আশাবাদ ও ঔদার্যের আবহাওয়ায়। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের আলোড়ন-বিলোড়নকারী তাণ্ডব কবির সেই আশা ও ঔদার্যের সৌধটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। সাম্রাজ্যগর্বী ক্ষমতামদমত্ত লোভী রাষ্ট্র গুলি যে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর পীড়নে কত নৃশংস ক্রূর বিবেকহীন হতেন।

পারে তার পরিচয় পেয়ে তিনি স্তম্ভিত হলেন। সেই সঙ্গে বিশ ও তিরিশের দশকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ও ক্রমশঃ তার করাল দানবিক ক্রিয়া-কলাপের বিশ্বব্যাপী আতঙ্ককর বিস্তারের দৃশ্যে কবির আত্মপ্রসাদ আর একটি প্রচণ্ড ঘা খেল। বলা যেতে পারে এই দুই সম্মিলিত বিমর্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই কবির ভাবজীবনের মৌলিক বদল। অত্যাচারী পর-পীড়কদের হাতে অগণিত দুর্বল অসহায় ভাগ্যহত মানুষের অপরিমেয় লাঞ্ছনায় কবির কাব্য-নির্ঝরের এতদিনে যথার্থই স্বপ্নভঙ্গ হলো। সেই থেকে কবির কাব্য কল্পনার স্রোত একান্তভাবে মানবিকতার খাতেই বয়ে চলতে লাগলো।

'পুনশ্চ' থেকে যে নয়া অভিযানের শুরু· 'শেষ সপ্তক, 'পত্রপুট', 'প্রান্তিক' 'সেঁজুতি', 'নবজাতক' প্রভৃতি কাব্য রচনার স্তর পেরিয়ে ক্রমে 'রোগশয্যায়', 'জন্মদিনে', 'আরোগ্য' 'শেষলেখা'-য় এসে তার শেষ। সময়ের হিসাবে পুরা এক দশকের পর্যটন। এই পর্যটন-পরিক্রমার ছকটি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই কবি যে শুধু এই পর্যায়ে মানবিকতার তত্ত্বেই অবিসম্বাদীরূপে দীক্ষিত হয়েছেন তাই নয়, মানবিকতার পাশে পাশে মানবিকতার হাত ধরে তাঁর চেতনায় এসে প্রবেশ করেছে সমাজতন্ত্রী প্রত্যয় এযুগের শ্রেষ্ঠ ভাবাদর্শ সাম্য কবির চিন্তা-চেতনাকে আলোড়িত করে তুলেছে তার লক্ষণ অতি স্পষ্ট)। ইতোমধ্যে তিনি ১৯৩০ সালে সোভিয়েট ভূমি পরিদর্শন করে এসেছেন। সে দেশের অ ভনব অমূল্য অভিজ্ঞতা সমূহ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' নামীয় ঐতিহাসিক পত্রগুচ্ছের আঙ্গিকে বিধৃত ও বিবৃত করেছেন। এর পর আর কি তাঁর বিগত পৃথিবীর ধ্যান ধারণার সংসারে ফিরে যাওয়া সম্ভব ?

বহুবিধ আথাল-পাথাল ওলট-পালট অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে নূতন রূপ-নারায়নের কূলে জেগে উঠলেন, সেখানে থেকে জগৎকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলেন। সত্যের রূপ যে কত কঠিন, আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় তার পরিচয় পেলেন। রক্তের অক্ষরে প্রত্যক্ষ করলেন আপনার রূপ। যাঁরা কবিকে নিরবচ্ছিন্ন ঋষি আখ্যা দিয়ে তাঁর এই রূপটিকে আড়াল করে রাখতে চান, তাঁরা কবির প্রতি সুবিচার করেন না, তাঁর কাব্যেরও খণ্ডিত অর্থ করেন মাত্র।

অন্যদিকে এক শ্রেণীর চরমপন্থী ব্যাখ্যাকারের আবির্ভাব হয়েছে—এঁদের মধ্যে নবীন প্রজন্মের লেখকই বেশী— যাঁরা কবির এই মানবিকতার দর্শনটাও স্বীকার করতে নারাজ। তাঁরা আবার আরেক প্রান্তীয় মতের প্রচারক। কবি যখন বলেন 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক',

(পরিচয়. সেঁজুতি) তাঁরা অবিশ্বাসের ঝোঁকে মাথা দুলিয়ে কবির সে-দাবি নাকচ করে দিতে উদ্যত এই যুক্তিতে যে, শ্রেণীস্বার্থের দিক দিয়ে কবি কখনও সাধারণ মানুষের গোষ্ঠীভুক্ত লোক হতে পারেন না, তাঁর মজ্জাগত শ্রেণী-পক্ষপাত যে-ঔপনিবেশিক মুৎসুদ্দী সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তার প্রতি সংলগ্ন না থেকেই যায় না। তিনি আসলে বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের একজন শোধনাতীত প্রতিনিধি, যতই না কেন তিনি শেষ বয়সের কাব্য-কবিতায় নাটকে-প্রবন্ধে-বক্তৃতায়-চিঠিপত্রে মানবতার বন্দনা করে অজস্র লিখে থাকুন এঁদের চিত্ত-কৃপণ দৃষ্টিতে কবির মানবিকতায় রূপান্তর সংশয়ের স্থল।

আমরা বলবো এটি নিতান্তই স্থূল বিচার। স্থূল বিচার এবং ভুল বিচার। কেউ বুর্জোয়া সমাজে জন্মগ্রহণ করলেই তিনি চিরকাল সেই সমাজের শ্রেণী-দর্শনের অঞ্চল-সংলগ্ন হয়ে থাকবেন, তাঁর কোন বিবর্তন বা পরিবর্তন হতে পারবে না—এটা এক ধরনের মারাত্মক নিয়তিবাদের প্রচার। যুগের ধর্মের সঙ্গে তাল রেখে যে মন সততপরিবর্তনকামী ও প্রগতিচঞ্চল, তাকে অপরি-বর্তনীয়তার অভিশাপের বাঁধনে বেঁধে রাখা যায় না—সে-মন নিয়তির নিগড় ভেঙে বেরিয়ে আসবেই। রবীন্দ্রনাথ এই রকম একটি সতত পরিবর্তনশীল রূপান্তরমুখী মনের দৃষ্টান্ত। তিনি যে-যাত্রাবিন্দু থেকে জীবনারম্ভ করেছিলেন বিচিত্র বিবর্তনের অধ্যায় পেরিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হবার কালে তার থেকে বহু, বহু দূরে সরে এসেছিলেন। সে এক সুদীর্ঘ পরি-ক্রমণ-রেখা, যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায় না। কাজেই মুৎসুদ্দী শ্রেণীর জীবন-দর্শনের ছকে রবীন্দ্র-দর্শনকে গণ্ডীবদ্ধ করবার চেষ্টা এবং সেখানেই তাকে ধরে রাখা হাস্যকর সরলীকরণের প্রয়াস মাত্র। আমাদের মতে, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ব্রহ্মবাদী, ঋষি, সনাতন ভারতের বাণীমূর্তি ইত্যাদি বলে প্রচার করেন তাঁরা যেমন এক ধরনের প্রান্তিকতার রোগে ভুগছেন, তেমনি যাঁরা বলেন শ্রেণী স্বার্থের বিচারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মানবমুখী বিবর্তন হওয়া অসম্ভব, তাঁরাও অন্য আর এক প্রকার প্রান্তীয়তার ধোঁকায় নিজেদের এবং অন্যদের ধোঁকা দিচ্ছেন। যে যুগে যিনি জন্মান সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিচার করাই নিয়ম, তা না করে তাঁকে পরবর্তী যুগের মূল্যবোধের মানদণ্ডে পরিমাপ করতে গেলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। বর্তমান ক্ষেত্রে সে জাতীয় বিভ্রান্তিই ঘটেছে; কবিকে তাঁর যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভিন্ন এক যুগের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের মাপকাঠি দিয়ে মেপে রায় দিতে চাওয়া হয়েছে। মানুষ মাত্রের মধ্যেই বিবর্তিত হবার অপরিসীম সম্ভাবনা থাকে, প্রতিভাশালী মানুষের

বেলায় সে সম্ভাবনা যে আরও কত বেশী অফুরন্ত সে কথা সহজেই অনুমেয়।

পুনরায় বলি, সত্য কখনও প্রান্তে বিরাজ করে না, মধ্যসীমায় বিরাজ করাই তার ধর্ম। দুই বিপরীত প্রান্তের কোনখানেই সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই জন্যই জ্ঞানীরা বলেন, মধ্যপথই হলো স্বর্ণময় পথ। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার অনুষঙ্গে এ-কথার সার্থকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। তিনি সমন্বয়ের সাধক। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ইহপরাঙ্মুখও নন, আবার তিনি একান্তভাবে বস্তুতান্ত্রিকও নন। তাঁর ব্রহ্মবাদের পরিকল্পনায় রূপ রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বৈচিত্র্যরসের প্রভূতস্থান রয়েছে। অন্যপক্ষে, তিনি মুৎসুদ্দী-বুর্জোয়া শ্রেণীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সত্য কথা, কিন্তু তাকেই তাঁর পথ চলার চিরকালীন নিয়তি বলে তিনি স্বীকার করে নেননি। ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমাগত নতুন হয়ে উঠেছেন। এই নিত্য নতুন হয়ে-ওঠাই তাঁকে সর্বশেষ পর্যায়ে মানবতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তীরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। এ-কথা যাঁরা মানতে চান না তাঁদের চিত্ত কার্পণ্য আরোগ্য হওয়া শক্ত।

২

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মানবতার আদর্শকে বরাবরই উদঘোষণ করে গেছেন তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে, তবে প্রথম বয়সে এই ঘোষণা কিছু অস্ফুট আকারে প্রকাশ পায় এবং তার ভিতর সচেতন ক্রিয়ার প্রভাব যত না ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল অচেতন স্বতঃস্ফূর্ত মানবপ্রীতির আবেগ। এই কারণেই দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্যের প্রথম পর্বের রচনাদিতে মানবপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে ছাড়া ছাড়া ভাবে, হঠাৎ হঠাৎ দমকের বশে সেগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতার কোন ক্রম নেই। পক্ষান্তরে শেষ পর্বের রচনায় মানবিকতার মহিমা একটা স্থায়ী ধুয়ার মত তাঁর তাবৎ সৃষ্টিকে ঘিরে রয়েছে ও তাদের বল যোগাচ্ছে। প্রথম ও শেষ বয়সের রবীন্দ্র-মানসের এমনতর পার্থক্যের মূলে আছে পরিবেশ ও সমাজ-স্থিতির বদল, সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাব এবং তার ফলে কবিমনের অনিবার্য বিবর্তন।

রবীন্দ্র মানসের এই বিবর্তনের ক্রমটিকে আমরা কিছু নির্বাচিত উদাহরণ ও উদ্ধৃতির সাহায্যে অনুসরণ করবার চেষ্টা করতে পারি।

প্রথম বয়সের রবীন্দ্র জীবন কেটেছে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দবাদের আবহাওয়ায়। পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খাত-বেয়ে-আসা বুর্জোয়া আশাবাদ ও ঔদার্যনীতি তাঁকে জীবনের দুঃখের দিকটা সম্পর্কে সচেতন হতে দেয়নি। তার উপর বাংলার গ্রাম তখনও তাঁর চেতনায় অনুপস্থিত ছিল। শহর কলকাতার

কবি শহরের আনন্দ-বিলাসের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। কবিতা গান নাটক রচনা আর আবৃত্তি অভিনয় নৃত্য গীতের আবহের মধ্য দিয়ে তখনকার কবির। জীবনপ্রবাহ বয়ে চলছিল তরতর ধারায়। তবু দেখা যায় এই সর্বব্যাপী আনন্দমুখরতার মধ্যেই কঠিন বাস্তবের চেতনা কবির কল্পনাকে দোল দিয়ে গেছে কখনও কখনও। ভোগের কবি বেদনার ভাষ্যকারে রূপান্তরিত হয়েছেন। প্রকৃতিপ্রেমের চালচিত্রের মধ্যে অজান্তে লেগেছে মানবমুখীনতার রঙ। তা যদি না হতো তো মাত্র কুড়ি বছর বয়সে নব যৌবনের কবি 'ভারতী মাসিকের পৃষ্ঠায় চীনে আফিমের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদীরা কিভাবে চীনকে শোষণ করে মৃতপ্রায় করে তুলেছে তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতেন না। 'চীনে মরণের ব্যবসায়' নামক এই প্রবন্ধে (ভারতী, জৈষ্ঠ্য ১২৮৮) কবি লিখেছেন ঃ

"একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে, বিষপান করানো হইল। এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় না। চীন কাঁদিয়া কহিল আমি অহিফেন খাইব না, ইংরেজ বণিক কহিল 'সে কি হয় ?' চীনের হাত দুইটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল দিয়া কহিল—'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরেজরা চীনে এই অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন··।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, যে কালে নবীন কবি 'প্রভাত সঙ্গীত', 'সন্ধ্যা সংগীত.' 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি রোমান্টিক কাব্য, 'বাল্মীক প্রতিভা,' 'মায়ায় খেলা' জাতীয় বিনোদনধর্মী গীতি-নাট্য এবং গদ্যে দান্তে ও রিয়াত্রিচে পেত্রাক ও লরা, পল ভর্জিনির প্রেমকাহিনী লিখছেন, সেই কালেরই রচনা এটি। তাতে দেখা যায় যে কবির অস্ফুট ও তখনও অবিকশিত চৈতন্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য রোমান্টিক ভাবাবেগের পাশে মানবিকতার আবেগও খানিকটা জায়গা করে নিতে পেরেছে এবং তাঁর স্বস্তি ও আনন্দকে কিছু পরিমাণে অস্থির করে তুলেছে। প্রবল উৎসব-কলরবের মুহূর্তেও কবি চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার অবিচারের কথা ভুলতে পারছেন না, তাই তার কলমের মুখে ওই জাতীয় চিন্তার প্রকাশ।

বস্তুতঃ চীনের সমস্যা বরাবর কবি-চেতনাকে আলোড়িত-মথিত করে রেখেছিল। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, এই প্রশ্নে কবির অন্তরসঞ্চিত বেদনা ও ক্ষোভকে ভাষা দিয়েছেন। আমরা এর প্রমাণ পাই কবির পশ্চিমী সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক একাটিক রচনার মধ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য',

'বিরোধমূলক আদর্শ', 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধে, সবুজ পত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে লেখা 'বাতায়নিকের পত্র' নামীয় পত্রগুচ্ছে, জাপানে প্রদত্ত Nationalism নামক প্রসিদ্ধ ভাষণাবলীতে আমেরিকার একাধিক বক্তৃতায় এবং সর্বশেষে জাপানী কবি ইয়োন নোগুচির সঙ্গে ঐতিহাসিক বিতর্কে। এছাড়া 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় চীনের নাম না করেও তিনি চীনকে মনে রেখে পাশ্চাত্য। বণিক/রাষ্ট্রগুলির অর্থগৃধ্নুতা, লুণ্ঠনতৎপরতা, দানবিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন, 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল, কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারত-বাসী শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে 'স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল তত তীব্র বেড়ে ওঠে', 'বিশ্বধরাতল আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার জঠরে পুরিতে চায়', 'চিতার আগুন পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদগার বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুপ্ত সভ্যতার মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা' প্রভৃতি ছত্র স্মরণীয়)। চীনের প্রসঙ্গ উঠলেই কবি আর স্থির থাকতে পারেননি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির 'ভদ্রবেশী বর্বরতার' বিরুদ্ধে ক্ষোভে রোষে ঘৃণায় উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছেন। কবির এই মহান্ মানবিক সংগ্রামী রূপের সামনে শ্রদ্ধায় আপনা থেকেই মাথা নুয়ে আসে।

তবু বলব, কবির এমনতর মানবতার অভিব্যক্তি, যে-কথার আভাস আগেই দিয়েছি, গোড়ার দিকে ধারাবাহিক ক্রমে একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত ছিল না, এক-একটা আকস্মিক বিক্ষেপের মত মাঝে মাঝে সে মতের আত্মপ্রকাশ ঘটতে আমরা দেখেছি। এর এই যে, কবি চেয়েছিলেন নির্মলপ্রেম, ঈশ্বরানুভূতি অতীন্দ্রিয়স্পৃহা ইত্যাদির মধ্যে একান্তভাবে বিভোর হয়ে থাকতে। কিন্তু তিনি তা পারেননি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এমন সব বিপর্যয়কর ঘটনা তিনি ঘটতে দেখেছেন যা তাঁর প্রাণের শান্তি, মনের আরামে ব্যাঘাত ঘটিতে তাঁর প্রকৃতি ও ঈশ্বরতন্ময়তার ছন্দে বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে—তিনি আর পূর্ববৎ তদগত-চিত্তে প্রেম ও পূজায় বুঁদ হয়ে থেকে বাস্তবকে ভুলে থাকতে পারেননি। বাস্তব জোর করে তাঁর কাছ থেকে তার প্রাপ্য মনোযোগ আদায় করে নিয়েছে।

এ কথার সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণ মধ্য বয়সের লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি (চিত্রা, ১৩০০)। এই কবিতার সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায় কবি একটা বাস্তববিমুখ পলায়নবাদী মনোভাবের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিলেন, সংসারের শত-সহস্র দুঃখ দৈন্যের সংবেদনময় অভিজ্ঞতা সহসা তাঁকে বিবেকের কশাঘাতে জাগত করে তুলেছে এবং মর্ত্য পৃথিবীর অভিমুখে সংবিৎ ফিরি

এনেছে। আর কল্পনার গজদন্ত মিনারে আরামের সুখশয্যায় লীন হয়ে থাকবার অবসর নেই, এবার তাকে 'সংসারের তীরে' ফিরে যেতেই হলো। তাই তো কল্পনার অধীশ্বরী দেবীর কাছে কবির এই করুণ মিনতি :

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর।"

শেষের দুটি ছত্রে কবি তাঁর নিজস্ব রোমাণ্টিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বেদনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু নিসর্গপ্রেমই হোক আর ঈশ্বরপ্রেমই হোক আর জৈব প্রেমই হোক, কবি আর সেসবের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে নারাজ—এবার তাকে সাধারণ মানুষের দুঃখ ও আর্তির মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই হবে, তাদের দুর্গতির সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করে তুলতে হবে।

কিন্তু কবির এই সদিচ্ছা কি স্থায়ী হয়েছিল? সত্যই কি এর পর থেকে কবি তাঁর রচনাবলীতে দুঃখী-আর্ত মানুষের জন্য বারে বারে, নিরবচ্ছিন্নভাবে, কাতর ক্রন্দনে উন্মুখর হয়েছেন? কই, তার তো তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। 'চিত্রা' থেকে 'বলাকা' 'পূরবী'র যুগ পর্যন্ত দীর্ঘবিসর্পিত এক যুগ—প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধান। এর মধ্যে 'নৈবেদ্য' আর 'গীতাঞ্জলির' দুই চারটি মানবমুখী কবিতা আর গান ছাড়া কাব্যের ক্ষেত্রে অন্ততঃ কোথায় 'এবার ফিরাও মোরে'র সদভিপ্রায়ের প্রমাণগ্রাহ্য বাস্তব প্রকাশ? এই থেকে কেউ যদি মনে করেন যে, কবির এই মধ্য বয়সের সদিচ্ছার ঘোষণা কল্পনার একটা সাময়িক পাশ্বর্-পরিবর্তন মাত্র, তার ভিতর ইচ্ছার আন্তরিকতা থাকলেও কর্মের জোর ছিল না তাহলে তাঁকে বোধহয় বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কল্পনার আবেশের একটা বিশেষ মোড়-ফেরতার মুহূর্তে কবি এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি লিখেছিলেন, তার পরেই আবার পাশ ফিরে ঐশী চেতনার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কবির এই স্বপ্নের ঘোর কাটতে আরও প্রায় তিন দশক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের আলোড়ন-বিলোড়নকারী ঘটনাবর্তের আঘাত-সংঘাত, ভারত শাসনের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কপটতা ও ক্রূরতা, ইউরোপমণ্ডে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় ও দিকে দিকে তার করাল বিস্তার—এসব এবং এই জাতীয় ঘটনার বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে

কবির আত্মপ্রসাদের আশ্রয়টিকে ভিতরে ভিতরে দুর্বল করে এনেছিল এবং এক সময় একেবারেই তাকে গুঁড়িয়ে দেয়। যে আশাবাদ আর ওদার্যবাদের আবহাওয়ায় জীবনভোর লালিত হয়েছিলেন চোখের সামনে দেখলেন তার ভিত সম্পূর্ণ নড়ে গেছে, পায়ের তলায় এখন জনসাধারণের পথচলায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিময় মৃত্তিকার অবলম্বন ভিন্ন আর কিছু নেই। কবি মানুষের সংসারে জেগে উঠে কঠিনকে জানলেন, সত্যের রূপ যে কত দুঃসহ তার পরিচয় পেলেন।

তাই বলছিলাম, কবির জীবনে মানবিকতার ব্যঞ্জনা পূর্বোক্ত মৌলিক রূপান্তরের পর্বের আগে পর্যন্ত একটানা সরলরেখায় কখনও অগ্রসর হয়নি, তার গতি আঁকাবাঁকা এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘবিরতির ছেদযুক্ত। এক একটা ভাবের জোয়ার এসেছে আর সেই জোয়ারের দমকে কবি মানবতার বন্দনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তার পরেই আবার যে-কে-সেই—ভাগবত উপলব্ধির আবেশে তন্ময় হয়ে গেছেন।

কিন্তু 'পরিশেষ' আর 'পুনশ্চ' কাব্যের সময় থেকেই দেখি কবির আর এক রূপ। পুনশ্চর 'ছেলেটা', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে' কবিতা একটা সুস্পষ্ট দিক-পরিবর্তনের নির্দেশ করছে। পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতায় মেলে বলাকার 'ঝড়ের খেয়া'র ভাবের আরও তীক্ষ্ণতর অনুবর্তন। ঝড়ের খেয়ায় শাশ্বত মানবতার পথের বিপ্লবী অভিযাত্রীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি লিখেছেন :

> "বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
> এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
> স্বর্গ কি হবে না কেনা।
> বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ ?
> রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।"

একই প্রশ্ন কবি একটু ঘুরিয়ে, আরও তির্যক আরও সুতীক্ষ্মভাবে, ভগবানের দরবারে রাখলেন তরুণ বিপ্লবীদের যারা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ রেখে তিলে তিলে হত্যা করেছে তাদের উপর অভিসম্পাত হেনে :

> "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।"

এরপর 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় এসে আমরা পেলাম ফ্যাসিবাদের নারকীয় সন্ত্রাস ও ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সময়োচিত সতর্কবাণী—

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে

প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

—কিংবা,

"…মহাকাল সিংহাসনে / সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মো'রে, / কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী / কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন / নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের / হৃৎস্পন্দনে, "

'সেঁজুতি' কাব্যের 'জন্মদিন' কবিতায় হিংস্র ও উন্মত্ত ফ্যাসীবাদী বর্বরদের দানবীয় লুব্ধতার ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ভাষায়—

"..ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা, / মাংস গন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা / শ্মশানের প্রান্তরে, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি / বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রি দিন করে ফেরাফেরি — / নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।"

এ তো গেল কাব্যের হিসাব। একাধিক প্রবন্ধে, রোলাঁ ও বারবুসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও মানবতার সপক্ষে উচ্চারিত মহৎ বাণীতে হিজলী জেলের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ আর আন্দামান রাজবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবির ঘোষণায়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিপূর্ণ মিস র‍্যাথবোনের কাছে লেখা খোলা চিঠিতে ও সর্বশেষে 'সভ্যতার সংকট' ভাষণের দৃপ্ত মানবিক নির্ঘোষে কবি তাঁর মানবতাবাদী স্বরূপটিকে বারে বারে উচ্চে তুলে ধরেছেন অসংশয়িত রূপে। প্রথম ও মধ্য বয়সের কাব্যসাধনার অপূর্ণতা শেষ বয়সের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার দ্বারা তিনি সুদে-আসলেই পূরণ করে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ও তাঁর উত্তরাধিকার

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর তেতাল্লিশ বছর কাল গত হয়েছে। এই কিঞ্চিদধিক চার দশক সময়-সীমার মধ্যে বাংলা কথাসাহিত্যের অনেক পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গল্পে উপন্যাসে সমাজচেতনার আদর্শের প্রভাব কমে গিয়ে ব্যক্তিস্বত্র, অন্তর্লীনতা, নির্জ্ঞান মনের জটিল-কুটিল চিন্তার রূপায়ণ, 'চেতনা প্রবাহ' নামীয় নূতন রীতির আশ্রয়ে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার প্রয়াস, যৌনতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের মাত্রা ও পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ সাহিত্যের সমাজমুখী মননের ঐতিহ্য হ্রাস পেয়ে তার জায়গায় ব্যক্তিমুখী মননের ঐতিহ্যের প্রসার ও পরিপুষ্টি ঘটে চলেছে। এটাকে শুভলক্ষণ বলতে পারিনে। কেন পারিনে তার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বাংলা কথাসাহিত্যের তিন শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল হলেন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র একান্তভাবেই সমাজাশ্রয়ী লেখক। এই দুই প্রসিদ্ধ লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর গঠনে বহুতর তারতম্য ছিল,—দৃষ্টান্তস্বরূপ একের ভিতর ছিল নীতিবাদের আধিক্য. অন্যজনের মধ্যে করুণার কোমলতা, তৎসত্ত্বেও এই এক 'সামান্য লক্ষণ' এঁদের দুইয়ের রচনার মধ্যে দেখা যায় যে, এঁদের কেউই সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদ বা 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। উভয়েই প্রবলভাবে সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতার তত্ত্ব স্বীকার করতেন, তাঁদের নিজ নিজ সাহিত্য সৃষ্টিকে সমাজ কল্যাণাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেই তাঁরা বরাবর লেখনী চালনা করে গেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কলাকৈবল্যবাদের তত্ত্ব পুরোপুরি মানতেন না। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের কবি সেই কারণে তাঁর কথাসাহিত্যে বারে বারেই কাব্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কাব্যকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত গীতিলতার (লিরিসিজম) সংস্কার তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের কাঠামোর মধ্যে অনুলিপ্ত হয়ে গেছে। এর ফলে লাভ-অলাভ দুই-ই হয়েছে। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য অবশ্য সৃষ্টির সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তার সামাজিক উপযোগিতার দিক কমে গেছে। কাল্পনিকতার ঐশ্বর্যে

ও কাব্যস্বাদে রবীন্দ্র-উপন্যাস ও ছোটগল্প চেখে চেখে ভোগ করার মত এক অপূর্ব শিল্পকর্ম (যেমন তাঁর ক্ষুধিত পাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র, পোস্টমাস্টার, জীবিত ও মৃত, অতিথি প্রভৃতি গল্প এবং ঘরে-বাইরে উপন্যাস), কিন্তু সেগুলিতে সমাজ-চৈতন্যের বস্তুভাগ অল্প। সমাজচৈতন্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, একথা না মেনে উপায় নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মানতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস উপরের বিবৃতির এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই উপন্যাসটি একাই একশো। এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এপিক উপন্যাসই শুধু নয়, এর ভিতর অত্যন্ত প্রখর সমাজচেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং এক মহৎ মানবিক আবেদনে এর বক্তব্য সমৃদ্ধ। বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে সারবান ও তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসরূপে যদি কোন উপন্যাসকে চিহ্নিত করতে হয় তো নিঃসন্দেহে সেই মর্যাদা গোরা উপন্যাসের প্রাপ্য।

তবু সব জড়িয়ে বিচার করে এ কথা বলতেই হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ কল্যাণাদর্শের ধারাবাহী লেখক শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের সমাজকল্যাণের ধারণার বিস্তর পার্থক্য ছিল, যার ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি গল্পোপন্যাসই সমাজচেতনার আভায় দীপ্ত, তবে তারই মধ্য থেকে কতকগুলি রচনাকে যদি আলাদা করে বাছাই করতে হয় তো এইগুলির উল্লেখ করতে হয়—পথনির্দেশ, বিলাসী, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশী বৈরাগী, অনুরাধা প্রভৃতি গল্প এবং বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই অরক্ষণীয়া, দেনা-পাওনা, বামুনের মেয়ে, শ্রীকান্ত প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, চরিত্রহীন, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন জাগরণ (অসমাপ্ত) প্রভৃতি উপন্যাস। এখানে এসব গল্পোপন্যাসের বিষয়-বস্তুর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন তবে শরৎচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও বলতে হবে যে, কথাসাহিত্যের শিল্পোৎকর্ষই তাঁর একমাত্র ধ্যেয় ছিল না শিল্পোৎকর্ষের প্রয়োজনের প্রতি পুরামাত্রায় অবহিত হয়েও তিনি তাঁর সাহিত্যকে সমাজচেতনায় মণ্ডিত করতে যত্নশীল থেকেছেন। সেই সমাজচেতনারও একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে, একটা বিশেষ বক্তব্য আছে, একটা কল্যাণের দিক আছে। বাংলা গ্রামসমাজের সামন্তবাদী শোষণ, অবদমন ও অত্যাচার, কৃত্রিম সামাজিক অনুশাসনের চাপে ব্যক্তিত্বের পেষণ ও অবলোপ, গ্রাম্যসমাজে নারীর অসহায় ও পরনির্ভর অবস্থা, তথাকথিত গ্রাম্যসমাজপতিদের জমিদার জোতদার ও সুদখোর মহাজনদের সহায়তায় পরপীড়নের উল্লাস ও

ক্রূরতা, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উৎকট দারিদ্র্য ও অবলম্বনহীনতা, নীচুজাতের লোকেদের প্রতি বর্ণশ্রেষ্ঠত্বাভিমানী ও বিত্তবান শ্রেণীর লোকেদের উদ্ধত ব্যবহার, গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণে অজ্ঞতা কুসংস্কার ও প্রথার দৌরাত্ম্যের দাপট, যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় অবতারণা করে শরৎচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টিকে সচেতনভাবেই সমাজের অভিমুখে চালনা করতে চেয়েছেন, নিছক শিল্পোপভোগের সীমায় তাকে বেঁধে রাখতে চাননি।

নাগরিক পটভূমিযুক্ত উপন্যাসগুলির এলাকায় এলেও দেখতে পাই এসব উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা ও প্রতিরোধের মনোভাব (পথের দাবী), নারীর বিদ্রোহ ও আত্মস্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা (শ্রীকান্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব এবং চরিত্রহীন), নারীজাগরণের আদর্শের বলিষ্ঠ শিল্পরূপ (শেষ প্রশ্ন) প্রভৃতি। প্রকারান্তরে এসব চিত্র-চরিত্রও সমাজচৈতন্যেরই প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের কারিকুরি ফুটিয়ে তোলার অন্তর্নিবেশমূলক শিল্পাভ্যাস থেকে এই শিল্পের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই শিল্পের আবেদন মোটেই ব্যক্তিসাক্ষিক নয়, পরন্তু সামূহিক, অর্থাৎ সমাজের সমষ্টিভূত বিবেকের কাছেই মূলতঃ এই শিল্পের আবেদন। তাছাড়া, এই শিল্প তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই বহির্মুখ নয়। স্বরূপত এই শিল্প বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তবঘনিষ্ঠ, গীতলতার সুরে বাঁধা কথাসাহিত্যের মত এই রচনা কল্পনানির্ভর নয়, নয় তা স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিমনের হিজিবিজি পাঁচালী। শরৎ-সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা সেই সাহিত্যের এক প্রধান সম্পদ।

শরৎসাহিত্যের এই সব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা যদি শরৎ-পরবর্তী ও সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের পর্যালোচনা করতে যাই তাহলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কতকগুলি বিসদৃশ সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আমরা দেখতে পাবো যে, শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের সমসাময়িককালে অথবা অব্যবহিত পরে বাংলা ভাষায় যে সব কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ লেখকবর্গ এবং আরও কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের ধারাটিকে মোটামুটি অনুবর্তন করে চলেছিলেন কিন্তু এ ভিন্ন অন্যান্য যেসব লেখক সমসাময়িক কালে সক্রিয় ছিলেন ও পরে বাংলা কথাসাহিত্যের বিভাগে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের

রচনার ধারার ভিতর শরৎচন্দ্রের প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না। অন্নদাশংকর রায় কিংবা বুদ্ধদেব বসু অন্যথা শক্তিশালী কথাকার হলেও তাঁদের রচনার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাঁরা নাগরিক মানসিকতার লেখক, বুদ্ধির বৈদগ্ধ্য এঁদের রচনার এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সমাজের গ্রামীণ স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা কিংবা সামাজিক নিপীড়নের কাহিনী শরৎচন্দ্রের কল্পনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল কিন্তু এঁদের লেখায় সেই চেতনার ছিটেফোঁটা পরিচয়ও পাওয়া যায় না। পাওয়া সম্ভবও ছিল না কারণ অন্নদাশংকর, বুদ্ধদেব অথবা তাঁদের স্বগোত্রীয় লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিংবা সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখেরা একান্তভাবে নগর জীবনের পশ্চাৎপটকে অবলম্বন করে তাঁদের কথা-সাহিত্যের প্রাকার গড়ে তুলেছিলেন, এবং সেই কথাসাহিত্যের পাঠ্যবস্তুর মধ্যেও ব্যক্তির সমস্যা যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, মানুষের সামূহিক জীবনের সমস্যা তার সিকির-সিকি মনোযোগও লাভ করতে পারেনি। অন্নদাশংকরের গল্পে-উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে মনঃপ্রকর্ষদীপ্ত পরিশীলিত নাগরিক উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত স্তরের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নরনারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংকট থেকে উদ্ভূত নানাবিধ জটিল পরিস্থিতির চিন্তাপ্রধান বর্ণনা, আর বুদ্ধদেব বসুর গল্পে-উপন্যাসে রূপ পেয়েছেব্যক্তিমনের অহংচেতনা তথা জৈব কামনাবাসনার অতি উচ্ছ্বসিত কিন্তু সুঠাম অভিব্যক্তি। কিন্তু এঁদের দুইয়ের রচনার এই এক প্রকৃতিগত সাদৃশ্য যে, তাঁদের দুজনেরই রচনাভঙ্গী অতিশয় বুদ্ধি উজ্জ্বল ও স্বাদু। তবে দুয়েরই বিচরণ একান্তভাবে ব্যক্তিকতার স্তরে এবং সেই ব্যক্তিকতাও আবার অর্থনীতির পৃষ্ঠপটবর্জিত। শরৎচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টির সামান্যমাত্র ছাপও এঁদের লেখার মধ্যে চোখে পড়ে না। ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের সাহিত্যে প্রথম 'চেতনা প্রবাহ' তত্ত্বকে উপন্যাসে রূপদান করবার চেষ্টা করেন। তাঁর অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা নামীয় ট্রিলোজী অনায়াসেই এই ক্ষেত্রে পথিকৃত্যের দাবি করতে পারে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই ধারাটিকে অনুসরণ করেন। তাঁর বৃত্ত, রাত্রি, সৃষ্টি, কল্মৈ দেবায় প্রভৃতি উপন্যাস এ কথার প্রমাণ। অবশ্য সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মরামাটি উপন্যাস গ্রামা-ভিত্তিক রচনা এবং বাস্তবতার চিত্রণে শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়। এটিকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মূলধারার রচনারীতির ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়।

শরৎ-উত্তর বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারকে সবচেয়ে সার্থকভাবে বহন করেছেন বলতে পারা যায় এই কয়জন লেখক—তারাশংকর, বিভূতিভূষণ,

শৈলজানন্দ, মানিক ও মনোজ বসু। একে একে এঁদের রচনার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর চোখ বুলনো যেতে পারে।

তারাশংকর শরৎচন্দ্রের দেখা গ্রামের পটকে আরও অনেক দূর সম্প্রসারিত করে নিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্র যেক্ষেত্রে তাঁর শিল্প মনোযোগ মূলতঃ গ্রামীণ মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষগুলির জীবনলীলার উপর কেন্দ্রীভূত রেখেছিলেন, তারাশংকর সেই স্থলে কেবলমাত্র এই দুটি স্তরে তাঁর মনোযোগ সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের একেবারে নীচুতলার জীবনের কেন্দ্রমধ্যেও তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। কাহার, বাগ্দী, বাজীকর, বেদে, সাপুড়ে, (সাপুড়ে জীবনের চিত্র অবশ্য শরৎ সাহিত্যেও বিলক্ষণ পাওয়া যায়), জেলে, মালো, নমঃশূদ্র, গ্রাম্য ম্যাজিক ও সার্কাস দলের খেলোয়াড়-খেলোয়াড়নী, ঝুমুরদলের অভিনেত্রী ও কবিয়াল, মুটে মজুর কুলিকামিন, অন্ধ ভিখারী প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের চরিত্র তারাশংকরের সাহিত্যে ভিড় করে এসেছে। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত রকমারি চরিত্রের সে এক সারিবদ্ধ মিছিল বলা যায়। ব্যাপ্তিতে ও বৈচিত্র্যে এখানে তারাশংকর শরৎচন্দ্রের পরিধিকে অতিক্রম করে গেছেন।

অন্যপক্ষে, আঞ্চলিকতার রূপকর্মের ছাঁচেও এঁদের দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র রূপায়িত করেছেন প্রধানতঃ হাওড়া ও হুগলী জেলার গ্রামকে, আর তারাশংকর একান্তভাবে তাঁর স্ব-জেলা বীরভূমের পরিবেশ ও মানুষকে তাঁর মনোযোগের বিষয়ীভূত করেছেন। বীরভূমের ভূ-প্রকৃতি তারাশংকরের রচনায় বিশেষ শিল্পসিদ্ধ মূর্তি লাভ করেছে (ধাত্রী দেবতা, গণদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা প্রভৃতি উপন্যাসের নিসর্গ বর্ণনা স্মরণীয়), তবে শরৎচন্দ্রের সমাজভাবনার সঙ্গে তারাশংকরের সমাজভাবনার পার্থক্য আছে। উভয়েই সমাজ-সচেতন লেখক এবং বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের সমস্যাগুলির বিষয়ে অবহিত। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে বাংলার গ্রামজীবনের অনুষঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের দোষ-ত্রুটি দেখিয়েই থেমে গেছেন, তারাশংকর তার উপরে একটি নতুন আয়তন যোগ করেছেন এইদিক দিয়ে যে, তিনি সামন্তবাদের প্রতীক জমিদারের সঙ্গে গ্রামের নয়া ধনিকের দ্বন্দ্বের ছবিও তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন (জলসাঘর, কালিন্দী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, অভিযান, সন্দীপন পাঠশালা প্রভৃতি গল্পোপন্যাস স্মর্তব্য), যার ছবি শরৎসাহিত্যে নেই। এক বিষয়ে অবশ্য শরৎচন্দ্র ও তারাশংকরের প্রচণ্ড মিল—তাঁদের রক্ষণশীলতায়

প্রকৃতিতে। শরৎচন্দ্র গ্রামীণ অবদমন-শোষণ-অত্যাচার-অবিচারের কঠোর সমালোচক হলেও—যে সমাজ ব্যবস্থার আশ্রয়ে এই অন্যায়গুলির পরিপুষ্টি তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেবার কথা কোথাও বলেননি. পক্ষান্তরে গ্রামে অপসৃয়মাণ জমিদারী ব্যবস্থার প্রতি তারাশংকরের মমত্ব স্পষ্ট। তারাশংকর নিজে একজন ছোটখাট জমিদার ছিলেন, সেই কারণেই হয়ত জমিদারতন্ত্রের প্রতি তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে মুখ্যতঃ গ্রামীণ নিসর্গের কবি-রূপকার হলেও তাঁর রচনায়ও বাস্তবতার উপাদান অনুপস্থিত কিম্বা অলক্ষ্য নয়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই ক্ষেত্রে তাঁর মিল যে, তিনি গ্রাম্য সমাজের অসহনীয় দারিদ্র্যকে এক অনস্বীকার্য অলঙ্ঘনীয় সর্বপ্রধান রিয়ালিটির মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাঁর যা কিছু নিসর্গ-প্রীতি প্রকৃতি-প্রেম অলৌকিকত্বের চেতনা যাই বলা যাক, তার সবই বিকাশ লাভ করেছে গ্রামজীবনের এই মৌলিক তথ্যটিকে ঘিরে—সর্বব্যাপী দারিদ্র্য। পথের পাঁচালী বলুন, অপরাজিত বলুন, আরণ্যক বলুন, ইছামতী-দেবযান বলুন, অশনিসংকেত বলুন, সর্বত্র এই মৌলিক তথ্যের স্বীকৃতি। মৃত্তিকা সংলগ্ন মর্ত্যজীবী গ্রামীন মানুষের একান্ত পার্থিব দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালার সঙ্গে উর্ধ্বচারী আকাশের বিহঙ্গ-কল্পনা মিশলে যে চেহারা দাঁড়ায় বিভূতিভূষণের গল্পোপন্যাস তারই শিল্পরূপ। খতিয়ে দেখলে অবশ্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ও শিল্পরূপের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

শৈলজানন্দ শরৎচন্দ্রের রচনারীতির একজন প্রত্যক্ষ ধারাবাহিক লেখক। কি ভাষায় ডৌলে কি দৃষ্টিভঙ্গীতে কি সংবেদনশীলতায় শৈশজানন্দ প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। গল্পোপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য আমাদের সচরাচর দেখা গ্রাম থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে বাংলা বিহারের সীমানা-সংলগ্ন কয়লা খনি অঞ্চলের প্রতিবেশের উপর স্থাপন করেছেন কিন্তু তাঁর রচনার রীতি একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রের শিল্পশৈলীর স্মারক। শৈলজানন্দের অভিনবত্ব এখানে যে তিনি শরৎসাহিত্যের ভিত্তিতলের উপর খনি সাহিত্য নামক একটি নয়া আয়তন সংযোগ করেছেন বাংলা ভাষায়, কিন্তু তলিয়ে দেখলে, উভয়ের বাস্তবতার প্রকৃতি এক। শৈলজানন্দ 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর' নামক যে অনবদ্য গল্পটি লিখেছিলেন তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে খনি পরিবেশের কোন সম্পর্ক নেই গ্রামের এক বন্ধ্যা নারীর সন্তান পিপাসার আর্তিকে কেন্দ্র করে এর বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। এই গল্পের

কৃতি একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রের ভাবের জগৎকে মনে করিয়ে দেয়। বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্পমালার ভিতর এটি অক্লেশে নিজের স্থান করে নিতে পারে।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম এবং শহর উভয় জীবনের পটভূমিকায় বাস্তবতার এক প্রথম শ্রেণীর রূপকার। শরৎচন্দ্র যদি বাংলা ভাষায় বাস্তবতার পথিকৃৎ হয়ে থাকেন তো মানিক সাহিত্যে সেই বাস্তবতার আরও উচ্চতর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানিক বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ রিয়্যালিস্ট লেখক! তবে তাঁর বাস্তবতা ও শরৎচন্দ্রের বাস্তবতার প্রকৃতিগত অনেকখানি ভেদ আছে।

রচনাশৈলীর মাধুর্যের কারণে তথা ভাষার সৌন্দর্যে শরৎচন্দ্রের বাস্তব চিত্রণ স্বাদুময়; পক্ষান্তরে, মানিকের বাস্তবতা রুক্ষ, রূঢ়, শুষ্ক। মাথার উপর অগ্নিবর্ষী প্রখর রৌদ্রের খরতেজ, চেষ্টা করলেও তার কোথাও স্নিগ্ধতার ছায়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানিকের কথাসাহিত্যে এমনতর শুষ্কতা আর পরুষভাবের কারণ তাঁর স্থিতাবস্থার প্রতি অনমনীয় আপসহীন মনোভাব এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতাধৃত মূল্যবোধগুলির সম্পর্কে সীমাহীন ঘৃণা। ঘৃণার উত্তাপে সবরকম কমনীয়তা ও লালিত্য সেখানে শুষে উবে গিয়েছে। কিন্তু অন্তর্ভেদী মানিকের মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং মানুষের আচরণের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির ব্যবচ্ছেদমূলক বিশ্লেষণী ক্ষমতা। ফ্রয়েড ও মার্কস তাঁর সাহিত্যে এক আধারে বিরাজ করেছেন। তবে শেষের দিকের রচনায় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে কমে গিয়ে মার্কসীয় বহিঃ-চেতনারই প্রাধান্য। নির্জ্ঞান মনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবচ্ছেদী ব্যায়াম ঘুচে গিয়ে তারজায়গায় সমষ্টি মানুষের সংগ্রামী জীবনের প্রতিষ্ঠা। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ ঐ আদর্শের মূলকথা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মানিকের মূল প্রভেদ এখানে যে, শরৎচন্দ্র সমস্যা উত্থাপন করেন কিন্তু তার সমাধান দেন না কিম্বা সমাধান তাঁর জানা নেই। মানিকের রচনায় সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান দুই-ই রয়েছে। তাঁর চোখে মজুর ও চাষীর অন্তহীন শোষণের প্রতিকারের একটিই মাত্র রাস্তা খোলা —কায়েমী স্বার্থবাদীদের সবলে প্রতিঘাত করা। প্রথম দিকের রচনা জননী, দিবারাত্রির কাব্য পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি প্রভৃতি উপন্যাস এবং প্রাগৈতিহাসিক, বিসর্পিল ও বৌ পর্যায়ের গল্প-গুলির ভিতর মনোবিকলনের আতিশয্য কিন্তু শহরতলী উপন্যাসের পর্ব থেকেই তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ও বহির্মুখ মনোভাবের প্রাধান্য। তার-পর একে একে দর্পণ, অহিংসা, চতুষ্কোণ প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শেষোক্ত

মনোভাবের আরও বেশী সম্প্রসারণ। তবে শেষের দিকের ছোটগল্পগুলির মধ্যেই বিশেষ করে অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের রুখে দাঁড়ানোর ছবি স্পষ্টতর। কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহের আভাসে এই রচনাগুলি সমাজচৈতন্যদীপ্ত সাহিত্যসৃষ্টির তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। যথা, ছোটবকুলপুরের যাত্রী, হারানের নাতজামাই, মাসিপিসি, পেটব্যথা প্রভৃতি গল্প। শরৎচন্দ্র গ্রামজীবনের অত্যাচারের ছবি দেখিয়েছেন কিন্তু অত্যাচারের প্রতিরোধের ছবি তেমন দেখাননি। সেই বাঞ্ছিত কাজটি করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক আমাদের সাহিত্যে একাধারে একজন উৎকৃষ্ট পর্যায়ের শিল্পী ও কর্মিষ্ঠ লেখক।

মনোজ বসু বাংলার যে অংশকে দক্ষিণবঙ্গ বলা হয় তার গ্রাম জীবনের একজন কমবেশী রোমাণ্টিক সার্থক রূপকার। তাঁর ওই স্বাদু-রম্য জীবন-চিত্রণের মধ্য দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাকে তিনি গভীর দরদের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর একাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাসে। মুসলমান চাষীর বাস্তব জীবনযাত্রার সুন্দর ছবি তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর লেখার আর একটি বড় গুণ হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যের দ্যোতনায় সাম্প্রদায়িক মিলনের ভাবটি তাঁর রচনায় বড় চমৎকার রূপ পেয়েছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে যত কথাই বলা হোক, শরৎচন্দ্রের ভাষার উজ্জ্বলতার সঙ্গে পরবর্তী কোন লেখকেরই কোন তুলনা হয় না। শরৎচন্দ্রের স্টাইল এক অনন্য সৃষ্টি। তাঁর ভাষাশৈলীতে সচেতন রূপকর্মের সঙ্গে প্রাঞ্জলতার শিল্পের এক অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর গল্পোপন্যাসের বিষয়বস্তু মূলতঃ গ্রামীণ, কিন্তু তাঁর ভাষার মেজাজ ষোল-আনা নাগরিক। বিদগ্ধ ও পরিমার্জিত স্টাইলে তিনি গ্রামের গল্প লেখেন। এমনটি আর পরবর্তী কোন লেখক, গ্রামজীবন যাঁদের রচনার মূল উপজীব্য, তাঁদের বেলায় দেখা যায়নি। তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ, মনোজ-মানিক প্রমুখ কথাকারদের ভাষাশিল্প শরৎচন্দ্রের তুলনায় অনেক কম পরিশীলিত, কম প্রসাধিত। মোট-কথা, এখনকার লেখকদের আর শরৎচন্দ্রের মত ভাষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের কথাকারদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দুই একজন লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা ভাষার প্রসাধনকলার প্রতি সবিশেষ অবহিত। কিন্তু তাঁরা এক্ষেত্রে বুঝি বা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়েই রইলেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কাব্যশৈলী

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যের গঠনে ভাবাবেগের একটা মস্ত বড় জায়গা রয়েছে। এই ভাবাবেগ এসেছে তাঁর কবিপ্রকৃতির সহজাত স্বতঃস্ফূর্তি থেকে, বক্তব্যবিষয়ের অভিনবত্ব থেকে, অভিনব বক্তব্যবিষয়কে পাঠকমনে গভীরভাবে মুদ্রিত করে দেবার আকুলতা থেকে, সর্বোপরি বাংলার কাব্যসংসারের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রতি বিমুখতা ও বিপক্ষতার মনোভাব থেকে। বাংলা কাব্যের গতানুগতিক মূল্যবোধের আবহাওয়ায় এযাবৎ যাঁদের মন লালিত ও বর্ধিত হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে সম্ভাবিত প্রতিকূলতা কল্পনা করে নিয়ে নতুন কবির মন সংকল্পে আরও বেশী কঠিন হয়েছে আর সেই সংকল্পের দৃঢ়তা থেকে প্রকাশের ভাষায় ও ভঙ্গীতে এসেছে আরও বেশী আবেগপ্রাবল্য, আরও বেশী প্রকাশব্যাকুলতা। ভাবাবেগের উদ্বেলতায় নজরুলের কবিতা যেন আঁকুপাঁকু করছে।

নজরুল কাব্যের আবেগসমৃদ্ধি বোঝাতে গিয়ে যে সমস্ত লক্ষণের দিকে অঙ্গুলিক্ষেপ করা হলো তার মধ্যে শেষোক্ত লক্ষণটির আরও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত বাংলা কাব্যের সংস্কার একান্তভাবে বুর্জোয়া চিন্তাচেতনার দ্বারা শাসিত ছিল। হয় অভিজাত মূল্য-বোধগুলির মাহাত্ম্যকীর্তন নয়তো মধ্যবিত্ত মানসিকতার জয়গানে বাংলা কাব্যের অঙ্গন ছিল মুখর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে কল্পনার উত্তুঙ্গ শীর্ষশেখর স্পর্শ করলেও উদার মানবতার অস্পষ্ট দিগ্‌দেশের বাইরে যে স্পষ্টচিহ্নিত বিরাট বিপুল জনজীবনের স্তর আস্তৃত রয়েছে তার বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর কল্পনাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারেননি। শেষ বয়সের কবিতায় এই দিকে একটা সচেতন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, লক্ষ্য করা যায় এই বাবদে তাঁর অপূর্ণতার বেদনার আর্তি, কিন্তু আর্তি আর্তিই থেকে গেছে, ছাড়া-ছাড়া উজ্জ্বল কবিতার দৃষ্টান্ত (যেমন 'জন্মদিনে', 'ঐকতান,' বাঁশী', 'ওরা কাজ করে', ইত্যাদি) বাদ দিলে, সেই অপূর্ণতার আর পূরণ হয়নি। অন্ততঃ জনজীবনের সুখদুঃখের ব্যাপক অভি ব্যক্তি রবীন্দ্রকাব্যে অ-কৃতই রয়ে গেছে। খতিয়ে দেখলে দেখা যায় রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর উর্ধ্বায়নের, অপেক্ষাকৃত কম সার্থক ভাবে ব্যাপ্তির অভিমুখে তাঁর কবিতার ঝোঁক। অর্থাৎ কবিগুরুর কল্পনার আবেগ দৃশ্যতঃ উল্লম্ব (vertical),

অনুভূমিক (horizontal) নয়। বৃহৎ- বিশাল শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সংসার নিয়ে তাঁর কবিতার জগৎ নয় রচিত। তাঁর কবিতা উর্ধ্বাকাশের দিকে যেমন থেকে থেকে পাখা মেলেছে, তেমন ভাবে চারপাশের ছড়ানো অনুভূমিক অর্থাৎ ভূমিতে বিস্তৃত জীবনের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারেনি। এই অকৃতকার্যতার স্বীকৃতি কবির নিজমুখের কবুলনামা থেকেই একাধিক বার ('এবার ফিরাও মোরে', 'ঐকতান' প্রভৃতি কবিতা দ্রষ্টব্য) পাওয়া গেছে, সুতরাং এ কথা বলায় আমাদের প্রত্যবায়গ্রস্ত হওয়ার দায় কম।

অন্যদিকে রবীন্দ্রোত্তর কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল হয় জাতীয়তায় আবদ্ধ, নয়তো পল্লীপ্রাণতা ও গৃহগতপ্রাণতায় ভরপুর। এঁদের কবিতার সাধারণ কুললক্ষণ ছিল যদিও মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য মনোজীবিতা, মধ্যবিত্ত পরিবারসুলভ সাংসারিক সুখ-দুঃখের চেতনা, তবুও প্রবণতাভেদে কেউ জাতীয় ভাবোদ্দীপনার দিকে বেশী ঝুঁকেছেন (যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায), কেউ পল্লীপ্রাণতা ও 'নস্টালজিক' ঘবে-ফেরার কাতরতার দ্বারা বেশী অস্থির হয়েছেন (যেমন কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়) ; আবার কেউ কেউ বা গার্হস্থ্য পারিবারিক রসের উদ্বোধনায় তাঁদের কাব্যের শক্তিকে প্রধানতঃ নিয়োজিত করেছেন (যথা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ)। কিন্তু এঁরা যিনি যাই করুন, রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রতিভার বলয়ের বাইরে যাওয়ার শক্তি এঁদের কারুরই ছিল না, কাজেই মূলতঃ মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করলেও রবীন্দ্র অনুগামী কবিসম্প্রদায়ের ছাপ নিয়েই এঁদের বাংলা কাব্য-সংসার থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের জাত একেবারে আলাদা। তিনি মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবি, কবি কথিত 'মাটির কাছাকাছি' স্তর থেকে সমুদ্ভূত হয়েছেন ; এসেই রবীন্দ্রোত্তর কবি সমাজের মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংস্কারটিকে সজোরে আঘাত করলেন। নজরুল গণ-মানসের কবি, নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীর মানুষের বন্ধু, চাষী ও মজুরের সত্যিকারের সুহৃৎ। তিনি একদিকে বাংলা সাহিত্যে সাম্যতন্ত্রের উদগাতা, অন্যদিকে বিদ্রোহের বাণীবাহক, অন্য আর একদিকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রতীক। এ সমস্তই বাংলা ভাষায় নতুন ভাবের সংযোজন। হিন্দু-মুসলমান মিলনাদর্শের অবশ্য কিছুটা পূর্ব-নজীর ছিল, রবীন্দ্রনাথই সেই নজীর ; কিন্তু সাম্য আর বিদ্রোহের এমনকি অস্পষ্ট পদপাতও বোধহয় এর আগে বাংলা কাব্যের অঙ্গনে শ্রুত হয়নি।

অত্যাচারিত শোষিত দুর্গত জনমানুষের দুঃখ বেদনার সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে নজরুলের কবিতা শুরু থেকেই এমন ভরপুর যে, এই নয়া আবির্ভাবের জাত গোত্র চিনতে কারুরই এতটুকু ভুল হওয়ার যো ছিল না। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল সর্বহারার কবি রূপে অভিনন্দিত ও সংবর্ধিত হলেন।

বিদ্রোহ অবশ্য নানা ধরনের হতে পারে। নজরুলের বিদ্রোহের ধরনটা কী প্রকার ছিল তা এক-নজর পরখ করা যেতে পারে। নজরুলের বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারী শোষক ও বঞ্চকের বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের পক্ষে; শক্তিমানের মদমত্ততার বিরুদ্ধে দুর্বলের পক্ষে; জাত্যভিমান বর্ণাভিমান শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ধনাভিমান ধর্মাভিমান প্রভৃতি সকল প্রকার দম্ভ ও দর্পের বিরুদ্ধে ওই অহংকার ও ঔদ্ধত্যের শিকার সাধারণ মানুষের পক্ষে। এই বিদ্রোহের সুর একেবারে অভিনব, বাংলা কাব্যে এমনতর বিদ্রোহের অনুরণন আগে কখনও শোনা যায়নি। এই বিদ্রোহের সুরে যেমন আছে একটা দৃপ্ত প্রতিবাদের ভঙ্গী, তেমনি আছে একটা রুদ্র তেজের ঝলক। অন্যায়-অসহিষ্ণুতা থেকে এই তেজোবহ্নি বিচ্ছুরিত হচ্ছে—তার ছটায় ক্রোধ ও রোষের স্ফুলিঙ্গ।

নজরুলের সমসময়ের কবি 'মরীচিকা' ও 'মরুশিখা' প্রণেতা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও তাঁর কাব্যে এক ধরনের বিদ্রোহের নিশান উড়িয়েছিলেন কিন্তু সে-বিদ্রোহের ধাঁচ-ধারার ভিতর শ্রেণী চেতনার কোন দ্যোতনা ছিল না, ছিল না লড়াইয়ের কোন মনোভাব। সে-বিদ্রোহ একান্তভাবেই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং নিছক কাব্যের স্তরে সীমিত। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক আনন্দবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দুঃখবাদকে প্রতিস্পর্ধী রূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এবং জীবন যে কেবলমাত্র আনন্দময়ই নয়, তার পাকে পাকে দুঃখের কণ্ট জড়ানো তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দুঃখী মানুষের বেদনার কথা বলেছেন কিন্তু যারা দুঃখী মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল তাদের বিরুদ্ধে দুঃখী মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে বলেননি। নজরুল সে-কাজটি করেছিলেন।

যদিও সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হবে যে, পরবর্তীকালে ওই সংগ্রামের তূর্য-ঘোষণা সুকান্তের কবিতায় যে রকম একটা ব্যাপ্ত তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে নজরুলের কাব্যে তেমন ঘটবার অবকাশ মেলেনি। তবে এটা লক্ষ্য করবার মত যে, নজরুল শোষিতদের প্রতি বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের কায়দায় শ্রেণী-সংগ্রামের আহ্বান না জানালেও, নিজেই তিনি শোষিতদের হয়ে তাদের শ্রেণী-শত্রুদের

বিরুদ্ধে সুতীব্র জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সকলের হয়ে একাই প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়েছিলেন।

এই একপাশি সংগ্রামের কারণেই তাঁর কবিতায় এমন আবেগের প্রাবল্য শক্ত হাতে-ছিলা-বাঁধা ধনুকের এমন ক্রেংকার-টংকার। 'বিদ্রোহী' কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা যেন আবেগের ঝড় বয়ে গেছে, সেই ঝড়ের দ্রুতগতি শব্দ-তুফানের মুখে দাঁড়িয়ে স্থির থাকা কঠিন। আগ্নেয়গিরির অগ্নিমুখ থেকে শব্দের লাভাস্রোত যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে এমনি ধারাসার ওই প্রবাহের অবিশ্রান্ততা। আবৃত্তির মাধ্যমে শুনলে মনে হয় যেন ধ্বনির অন্তহীন, ক্লান্তিহীন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার দাবি করেছিলেন যে, তাঁর 'আমি' নামক কাব্যভঙ্গিম গদ্য-প্রবন্ধের আদলে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচিত। এই অভিযোগের ভিত্তিহীনতা নজরুল নিজেই প্রতিপাদন করে গিয়েছেন একদা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোড়ন-সৃষ্টিকারী গুরু শিষ্যের, দ্রোণগুরু ও একলব্য-শিষ্যের ঐতিহাসিক উত্তর-প্রত্যুত্তরের লড়াইয়ের মধ্যে। তবুও তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বিদ্রোহী কবিতা আমি-র আদলে রচিত তাতেই বা কী? এই দুইয়ের রচনাভঙ্গীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি নিছক বিবৃতিমূলক গদ্যরচনা, অন্যটির কুহরে কুহরে 'সৃষ্টিসুখের উল্লাস' যেন ফেটে পড়তে চাইছে। বিদ্রোহী কবিতার ইতস্ততঃ-চয়িত যে-কোন স্তবক নিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে।

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি;
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বির, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল ঠমকি ছমকি,
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি,
ফিং দিয়া দিই তিন দোল।
আমি চপলা চপল হিন্দোল।

কিংবা অন্য একটি স্তবক :

আমি শ্রাবণ প্লাবন বন্যা
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস বন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা বিষধর কাল-ফণী !
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

এইরূপ কবিতাটির সর্ব অঙ্গ ছেয়ে এক ভাবাবেগের প্লাবন বয়ে গেছে। আগাগোড়া একটা অস্থিরতা, অশান্ততা, প্রাণশক্তির উদ্দামতা। শাসন-নাশন বারণ-বন্ধন না-মানা প্রবৃত্তির অবারিত উচ্ছ্বাস। নজরুল তার 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতায় লিখেছেন—"আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে !" বিদ্রোহী কবিতার সকল অবয়ব জুড়ে এই দুয়ার-ভাঙা জোয়ারের কল্লোল লক্ষ্য করা যায়। আর শুধু বিদ্রোহী কবিতাই বা বলি কেন, 'সাম্যবাদী', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'ফরিয়াদ', 'সব্যসাচী', 'সর্বহারা', 'কাণ্ডারী হুসিয়ার', 'পূজারিণী', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রচনাগুলির সব কয়টির বাঁধুনির মধ্যেই কি এই আবেগের উচ্ছলতা লক্ষণীয় নয় ? এমনকি তার আপাত-মধুর প্রেমের গানগুলিও কি এই লক্ষণ মুক্ত ? মানুষটি যিনি ছিলেন আপাদমস্তক আবেগে জরোজরো, আশৈশব প্রাণচঞ্চল চিত্তের সহজাত স্ফূর্তিপ্রাচুর্যে ভরপুর, তিনি তাঁর কবিতার গঠনে ও বিন্যাসে আবেগকে বাদ দিয়ে চলবেন, এ কি কখনও ভাবা যায় ?

নজরুল কাব্যের এই আবেগ-সমৃদ্ধিকে উন্নাসিক সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ অনুৎকর্ষের একটি প্রমাণ বলে গণ্য করেন এবং বলতে চান যে, তাঁর কবিতার বাঁধুনিতে যে আঙ্গিকগত শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়, প্রায়শঃ যে শব্দের যথেচ্ছাচার চোখে পড়ে তাঁর কবিতার ধ্বনিবিন্যাসে, তার মূল লুক্কায়িত রয়েছে এই আবেগাতিশয্যের মধ্যে ! অর্থাৎ কিনা, জবজবে আবেগের সংক্রমণের কারণে তাঁর কবিতায় অনেক সময়ই মাত্রাসাম্য রক্ষিত হয়নি, কবিতার গঠনগত পারিপাট্যের দিকটা প্রায়শঃ সেখানে অবহেলিত থেকে গেছে। নজরুল-কাব্য রবীন্দ্রকাব্যের মত ছিমছাম, সুবিন্যস্ত নয়, 'ফর্ম'-এর সংহতি ও সংযম তাঁর কবিতার গুণাবলীর মধ্যে পড়ে না। ইত্যাদি।

আপাত-দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই অভিযোগের বয়ানের ভিতর কিছুটা সারবত্তা আছে বলে মনে হতে পারে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে এই অভিযোগ লক্ষ্যবেধী নয়। অভিযোগটির যথার্থতা স্বীকার করবার হেতু নেই। যে কবি বাংলা কাব্য সংসারের প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিপরীতাচরণে সম্পূর্ণ নতুন কথা বলবার জন্য লেখনী ধরেছেন, যিনি বাংলা কবিতায় নয়া এক আয়তন যোগ করবার জন্য বদ্ধপাণি হয়েছেন, তাঁর রচনায় আবেগের প্রাবল্য না থাকাটাই তো একটা বড় রকমের বিচ্যুতি বলে গণ্য হওয়া উচিত। কাজেই যেটাকে আবেগের অতিরেক বলে মনে হচ্ছে সেটা নজরুল-কাব্যের অনুষঙ্গে আবেগের অতিরেক নয়, আবেগের ঐশ্বর্য।

আর তাছাড়া, সর্বহারা মানুষের কাছাকাছি স্তরে রয়েছেন এমন যে কবি, তেমন মৃত্তিকা সংলগ্ন শ্রেণী সচেতন জনজীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় এক কবি নাগরিক বৈদগ্ধের পরিশীলিত আঙ্গিকে, পরিপাটি শব্দশৈলীতে, কবিতা রচনা করবেন এটা কেমন করে আশা করা যায়? নজরুলের কবিতায় আবেগের প্রাচুর্য কি অমনি এসেছে? এসেছে তাঁর শ্রেণী চেতনার সূত্রে, শ্রেণী-বিভক্ত মানসিকতা-সঞ্জাত বুর্জোয়া জীবনাদর্শের প্রতি বৈরিতার সূত্রে। কায়েমী স্বার্থবাদী সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষগুলির শোষক স্বরূপকে উদঘাটন করবার জন্য যাঁর কবিতায় আযোজনের সীমা পরিসীমা নেই তিনি নাগরিক কবিসুলভ দরবারী শব্দকলার আশ্রয়ে নিখুঁত ছন্দ মিল বিশিষ্ট ছিমছাম সাফ সুতরো কবিতাদেহ গঠন করবেন, জনতার কবির কাছ থেকে এ এক অসার প্রত্যাশা।

শিল্পের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে এ কথা আমাদের খেয়াল রেখে চললে ভাল যে, আঙ্গিক পারিপাট্য সব সময়েই শিল্পের ঔজ্জ্বল্যের দ্যোতক নয়, কখনও কখনও সেটা শিল্পের রক্তহীনতাকে ঢাকবার একটা প্রকরণ। পোশাকের আড়ম্বর তথা সুদৃশ্যতা স্বতঃই দেহের সুস্থতা সূচিত করে না। বিপরীত অবস্থাকে আড়াল করবার একটা কৌশল হওয়াও সম্ভব। নজরুলের কবিতার বক্তব্য এত বেশী জোরালো আর তেজালো যে, তার জন্য সুর চড়াবার কিছুটা প্রয়োজন ছিল বই কি। মিহি মোলায়েম ভঙ্গীতে কখনও কি বিদ্রোহের আমেজ আনা যায়, না পরিপাটি সংহত সুবিন্যস্ত ভাষার আদলে সংগ্রামী মনোভাবকে প্রকাশ করা চলে?

নজরুলের কবিতায় মুসলমানী অর্থাৎ আরবী-ফার্সী শব্দের আধিক্য কারও কারও কাছে নাকি তেমন প্রীতিপ্রদ নয়। অনুমান করা কঠিন নয় এই

আপত্তি গোঁড়া হিন্দুমহল থেকে আসাই স্বাভাবিক, যাঁদের অনেকেরই রুচি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংস্কারে গঠিত ও লালিত। এঁদের কান সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ধ্বনিভঙ্গিমায় এতটাই অভ্যস্ত যে, মুসলমানী শব্দের বাহুল্য তো অনেক পরের কথা, খাঁটি দেশজ শব্দের বহুল প্রয়োগটাও এঁরা সহজে বরদাস্ত করতে পারেন না। সংস্কৃতের স্পর্শ রহিত যে-কোন শব্দই ওঁদের কুলীন কানে খট্ করে গিয়ে বাজে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে নিকষ হিন্দুয়ানী কর্ষিত কানে 'খুন,' 'লুট', 'পানি,' 'গোস্ত', 'বেহেস্ত' প্রভৃতি শব্দ যে জল-অচল ঠেকবে তাতে আর আশ্চর্য কী। নজরুলের একাধিক কবিতায় আরবী ফার্সী শব্দের ছড়াছড়ি রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর 'কামাল পাশা,' 'শাতিল আরব', 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী' প্রভৃতি কবিতায় এইসব শব্দের সমধিক বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুল এটা অকারণে করেননি। কবিতার বিষয়বস্তুতে যেখানে যে পরিবেশ বর্ণনীয়, তার ভাবটিকে পরিস্ফুট করবার জন্যই কবি সচেতনভাবে এইসব শব্দ-প্রকরণের আশ্রয় নিয়েছেন। কখনও দেশী বা মুসলমানী শব্দের সাহায্যে উদ্দিষ্ট অর্থ আরও বেশী জোরদার করা যায়, সেই কারণেই তাঁর এইসব শব্দের প্রতি এমনতর পক্ষপাত।

তিনিই এ ক্ষেত্রে প্রথম পথ দেখালেন তা নয়। তাঁরই অব্যবহিত আগে ও সমসময়ে হিন্দু কবি মোহিতলাল মজুমদারও তাঁর 'স্বপন-পসারী' ও 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে আখছার মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করেছেন কবিতার অভিপ্রেত ভাব পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে। মোহিত-লালের 'নাদির শাহ,' 'কালাপাহাড়,' 'নুরজাহান,' প্রভৃতি কবিতা এ কথার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। ঠিক ঠিক মনোমত ভাব ফোটাতে লাগসই শব্দ—তা সে শব্দ যে ভাষারই হোক-না কেন—কী জাদুর মত কাজ করে মোহিতলাল আর নজরুলের কবিতার সংশ্লিষ্ট উদাহরণগুলি থেকে তার প্রমাণ মিলতে পারে। ('কামাল পাশা' কবিতার 'কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই' কথাটি এইভাবে না বলে যদি অন্যভাবে বলা হতো যে কামাল তুমি কী আশ্চর্য বিস্ময় সংঘটিত করেছ—তাহলে তাতে না থাকত অনুপ্রাশের দোলা, না থাকত বক্তব্য বিষয়ের তির্যক তাৎপর্য। লাগসই কথা লাগসই ভাবে বলতে পারার মত শিল্পসিদ্ধি আর কিছু কি আছে ?

অন্যপক্ষে, কাজী সাহেবকে সম্পূর্ণ বিপরীত মহল থেকেও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে একই ধরনের কারণে। তিনি মুসলমান কবি হয়ে তাঁর কবিতায় এত হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন কেন, কথায় কথায় এত

বেশী রামায়ণ মহাভারত-পুরাণাদির নজির টেনে আনেন কিসের ঝোঁকে—এই প্রশ্ন এবং অনুরূপ ধরনের প্রশ্ন বরাবর তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে মোল্লা-মৌলবী মহল থেকে কিংবা তাঁদেরই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত গোঁড়া মুসলিম পাঠক সম্প্রদায় থেকে। নজরুল নিজেই এই দুই ধারার আপত্তিকারক-দের আপত্তির ভাষাটাকে রূপ দিয়েছেন এইভাবে—,

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্‌লারা' কন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে।
ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও,
'আম পারা'—পড়া হাম-বড়া মোরা এখনো 'বেড়াই ভাত মেরে।'
হিন্দুরা ভাবে, ফার্সী শব্দের কবিতা লেখে ও পা'ত নেড়ে।'

কবিতার অনুপ্রাস ও তদন্তর্গত ব্যঙ্গ লক্ষণীয়। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা থাক, আসল কথা নজরুল তাঁর কবিতায় হিন্দু প্রসঙ্গ আর মুসলিম প্রসঙ্গের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে বিগত পাঁচশত বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি যে মূলতঃ হিন্দু-মুসলমানের যৌথ চেষ্টায় গঠিত সংস্কৃতি সমন্বয়ের ফলশ্রুতি, সেই ভাবটিকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন কবিত্বের আধারে। হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রয়াসে গড়া যুগ্ম সংস্কৃতির ভাববস্তুর রূপায়ণে কখনও তার হিন্দু স্বরূপটার উপর বেশী ঝোঁক পড়েছে, কখনও প্রয়োজনে মুসলিম স্বরূপটিকে পাঠকের মনোযোগের কেন্দ্রমধ্যে এনে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু ওই দুই রকমফের সত্ত্বেও মৌলিক সংস্কৃতিটির চেহারা বরাবর ভারতীয়ই থেকে গেছে।

এই দৃষ্টিতে যদি আমরা বিদ্রোহী কবির কাব্য-কবিতা কে বিচার করি তাহলে তাঁর রচনা কেন কখনও হিন্দুর পোশাক পরে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনও মুসলমানী পোশাক প'রে—তার কারণটা ধরতে পারব। আর শুধু কবিতার কথাই বা বলি কেন, গানেও কি কবির একই মনোভাব কাজ করেনি? এই যে নজরুল প্রায় একই সময়ে, বলতে গেলে প্রায় একই নিঃশ্বাসে, ইসলামী গান ও হিন্দু ভক্তিসঙ্গীত রচনা করেছেন—তাকে ধর্মের দৃষ্টিতে না দেখে কি এই দৃষ্টিতে দেখা চলতে পারে না? এ বড় আশ্চর্য যে. যিনি নবীর গান লিখেছেন, মারফতি মুর্শিদ্যা ভাবের বাউল গান লিখেছেন, ঈদের চাঁদের বন্দনা লিখেছেন, এমনকি মুসলমানী ছাদ-পেটানো গান লিখেছেন, তিনিই আবার মন-মেজাজের আরেকটা ফেরতার সময় শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, কালীকীর্তন

ইত্যাদি ধরনের গান লিখে লিখে গানের খাতা ছয়লাপ করে দিয়েছেন। যখন যিনি এসে যে ভাবের গানের ফরমায়েস করেছেন—তা ইসলামী গানই হোক আর হিন্দু দেবদেবীর গানই হোক এক অসাধারণ সৃষ্টিকুশল কবি ও গীতিকারের স্ফূর্ত কলমের মুখে স্বতোৎসার ও অবিরল ধারায় সেই গানের স্রোত নির্বারিত হয়ে এসেছে!

এর ভিতর যাঁরা ধর্মের উম্মাদনা খুঁজতে যান তথা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আবিষ্কারে সচেষ্ঠ নন তাঁরা তাঁদের রুচি অনুযায়ী তা করতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে বিবাদ করবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু আমাদের চোখে নজরুলের এই সাধনার তাৎপর্য ভিন্ন। তাঁর সাধনা ধর্মীয়তার সাধনা নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ী রূপটাকে তাঁর কাব্য ও সংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরার সাধনা। গোটা প্রয়াসটার ঝোঁক হলো সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক নয় এই কথাটা যত আমরা বেশী বুঝতে পারব, নজরুলের প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা তত কমবে। নজরুলকে আধ্যাত্মিক যোগী বানাবার চেষ্টা, তাঁ প্রকট হিন্দুত্বের রঙে রঞ্জিত করে—মহল বিশেষের কারসাজি মাত্র, তাতে সত্যে জোর নেই।

তিন

কিন্তু নজরুল কি শুধুই বিদ্রোহী কবি? সংগ্রামী কবি? তাঁর কাব বীণায় কেবলই কি রুদ্ররাগের ঝঙ্কার-ঝঙ্কার বেজে উঠেছে? তিনি কি একই কালে প্রেমিক নন? তা যদি না হয় তো 'অগ্নিবীণা', 'সর্বহারা 'ফণি মনসা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলির পাশে পাশে 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট 'সিন্ধু-হিল্লোল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করলেন কেমন করে? শিশু মনোলোভা 'ঝিঙেফুল' কবিতার বইটিই বা তাঁর লেখনী মুখ থেকে নির্গ হলো কী উপায়ে? এই আপাত-বিসদৃশ দুই ঘটনার সহাবস্থান বা সমবর্তি থেকে এই কথারই কি প্রমাণ হয় না যে যিনি বিদ্রোহী তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক অথবা যিনি শ্রেষ্ঠ প্রেমিক তিনিই জীবনের কোন না কোন পর্বে বিদ্রোহের বে ধারণ করতে বাধ্য হন? মানুষের প্রতি ভালবাসার টানেই তিনি বিদ্রো পথে আসেন, তাঁর প্রেমই তাঁকে বিদ্রোহীর বর্ম অঙ্গে ধারণ করতে অনুপ্রাণি করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী বিপ্লবীরাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক কথার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় আমরা বারেবারেই পেয়ে এসেছি। বি বিদ্রোহ প্রেমের আবেগেরই একটা রূপান্তরিত বেশ মাত্র।

প্রেমিকেরা কেন বিদ্রোহীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন? সেটা এইজন্য যে, কোন জাতি বা রাষ্ট্র বা সমাজের চলার পথের বিশেষ বিশেষ ক্ষণে এমন অবস্থার উদয় হয় যখন আর নির্বিরোধ প্রেমিকের ভূমিকায় মানায় না, প্রেমিকের পরিচ্ছদ ত্যাগ করে বিদ্রোহীর রণবেশ অঙ্গে ধারণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। বাঁশী তখন অসিতে রূপান্তরিত হয়, চোখের মধুর হাসি পর্যবসিত হয় বজ্রাগ্নিজ্বালায়।

নজরুলের জীবনেও এমনটাই হয়েছিল বলে ধারণা হয়। সহজাতভাবে মানুষকে ভালবেসে ও মানুষের ভালবাসা পেয়ে সুখী এক মানুষ অবস্থার চক্রে ও ঘটনার সংঘাতে বিদ্রোহকেই জীবনের একমাত্র কাম্যকর্ম বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। অন্যায়—তা রাষ্ট্রিক স্তরেরই হোক আর সামাজিক স্তরেরই হোক—তাকে প্রতিরোধ করা যে-কোন প্রেমিক মানুষেরই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তা নয়তো তার প্রেমের মর্যাদা থাকে না, প্রেম একটা ফাঁকা বুলিমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে ভালবাসলে তার মূল্য দিতে হয়, শ্রেষ্ঠ প্রেমিককে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে হয়। নজরুল বিদ্রোহের রাস্তায় এসেছিলেন গভীর মানবপ্রেমের রাজবর্ত্ম অনুসরণ করে। তাঁর কবিতায় এত কেন আবেগের প্রাচুর্য, এত কেন আত্মপ্রকাশের আকুলি-বিকুলি, এত কেন ভাবের দুর্বার প্রবাহ—এই দৃষ্টিতে দেখলেই বোধকরি তার সঠিক ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

সুকান্তের কবিতার শিল্পমূল্য

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে মহল বিশেষ থেকে প্রচারবাদী কবি আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ভাবখানা এই যে, কবিতাকে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম প্রচারের বাহন করে তুলেছিলেন, তার আগে বাংলায় যাঁরা কাব্য কবিতা লিখতেন তাঁদের কেউই প্রচারবাদী কবি ছিলেন না। 'প্রচারবাদী' কথাটা আসলে গোলমেলে। বক্তার অভিধায় অনুযায়ী এর নানারকম মানে করা যেতে পারে। কদর্থ হামেশাই করা হয়। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে, সব কবিই কোন না কোন অর্থে প্রচারবাদী। যিনি সাম্যবাদকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে কবিতা রচনা করেন তিনিও প্রচারবাদী। আবার যিনি সাম্যবাদের বিপরীত ভাবাদর্শের অবলম্বনে কবিতা রচনা করেন তিনিও প্রচারবাদী। সাম্যবাদ-অসাম্যবাদ, বস্তুবাদ-ভাববাদ, বিশ্বজনীনতা-সংকীর্ণ গৃহগতপ্রাণতা যিনি যে বিষয়বস্তু নিয়েই কবিতা লিখুন না কেন, প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই প্রচার আছে। বস্তুতঃ প্রচার ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। যে কবি ভাববাদের পরিমণ্ডলে বাস করে কাব্যচর্চা করেন এবং কাব্যের বিষয়বস্তুতে ভাববাদকে প্রতিফলিত করেন তিনি হয়ত এই বলে আত্মসন্তোষ লাভ করেছেন যে, তিনি তাঁর কবিতায় কোনরূপ প্রচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন না, তিনি বিশুদ্ধ ভাবের কবিতা প্রণয়নে ব্যাপৃত রয়েছেন। কিন্তু আসলে তিনিও এক ধরনের প্রচারকেই কবিতার উপজীব্য করেছেন—সে পচোরের গায়ে যে-তকমাটি আঁটা তার নাম ভাববাদ! আর ভাববাদ তো অনেক বড়সড় ব্যাপার, এমন যে নিরামিষ নিরীহ পল্লীকবিতা, যাতে শান্তমধুর গৃহকোণের জয়গান করা হয় এবং গ্রাম-ছেড়ে-শহরে-চলে-আসা মানুষদের ঘরে ফেরার ডাক দেওয়া হয়, তার ভিতরেও সূক্ষ্ম প্রচার রয়েছে। সে প্রচারের উদ্দেশ্য প্রচলিত অবস্থা-ব্যবস্থার প্রতি মোহসৃষ্টি এবং পরিবর্তন বিমুখতা। আমাদের বাংলা কাব্যের সংসারে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদে' রচনাকে এই গোত্রের কবিতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

সুতরাং কোন কবি তাঁর কবিতায় সাম্যবাদ প্রচার করেন কোন কবি প্রচার করেন ভাববাদ, সেটা তাঁকে প্রচারবাদী আখ্যা দেওয়ার কারণ বা ভিত্তি হতে পারে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রচারবাদ কথাটারই কোন মানে হয় না।

সব কবিই কোন না কোন অর্থে, কোন না কোন দিক দিয়ে প্রচারবাদী। প্রচার ছাড়া কবিতাই হয় না। সুকান্তের কবিতায় নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের প্রতি যে অমেয় সহানুভূতি এবং তদ্বিপরীতে অত্যাচারী-বঞ্চক শোষক-শ্রেণীর মানুষের প্রতি যে সীমাহীন রোষ ও ঘৃণার প্রকাশ আছে তা একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ সঞ্জাত কাব্যের অনুভব। তাঁর বিষয়বস্তুতে আছে একটা বিশেষ বক্তব্য। সে-দৃষ্টিকোণ ও সে-বক্তব্য কারও ভাল না লাগতে পারে, তাই বলে সেই নজীরে তাঁকে প্রচারবাদী আখ্যা দিয়ে তাঁর কবিতার শিল্পমূল্যকে খারিজ করবার চেষ্টা কোন্ দেশী কাব্যবিচার? কবিতা কি তার বিষয়বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে থাকে? না, থাকে তাঁর খাঁটি অনুভবের মধ্যে, প্রকাশের ব্যঞ্জনার মধ্যে, শব্দ-ছন্দমিল ভাষাভঙ্গী-আঙ্গিক ইত্যাদির বিশেষ শিল্পসিদ্ধির মধ্যে? যদিও বিষয়বস্তু মোটেই তুচ্ছ নয়, তাহলেও কেবলমাত্র বিষয়বস্তুই কি কাব্যবিচারে একমাত্র নিরিখ হতে পারে? কবিতার পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি কি তার চেয়েও বেশী গণনীয় নয়?

সুকান্তের কবিতায় সাম্যবাদ, সমাজবাদ, জনগণতন্ত্র, মানবমুখীনতা যাই থেকে থাকুক ভাববাদের আবহাওয়ায় আজন্ম লালিত ও স্থিতাবস্থার সঙ্গে স্বার্থসূত্রে জড়িত কোন পাঠকের পক্ষে সে মত পছন্দ না হতে পারে কিন্তু তা বলে তাঁর কবিতার শিল্পমূল্যকে কি অস্বীকার করবার যো আছে? সাম্যবাদ-ধনবাদ, বস্তুবাদ ভাববাদ প্রভৃতি প্রসঙ্গকে একপাশে সরিয়ে রেখে নিছক কবিতার নিরিখেই যদি কবিতার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনুভবের তন্নিষ্ঠ মূল্যায়নই যদি কাব্যবিচারের মানদণ্ড হয় সেক্ষেত্রে কোন উপায়েই কি সুকান্তের শক্তিমত্তাকে অগ্রাহ্য করা যায়? এই কবি নতুন ভাবের ভাবুক; নয়া দর্শনের প্রবক্তা, ভবিষ্যৎ সুন্দর পৃথিবীর স্বাপ্নিক হলেও তাঁর মত ঐতিহ্য সচেতন কবি আমাদের রবীন্দ্রোত্তর পর্বের কবিকুলের ভিতর কয়জন আছেন? এমন নিটোল শব্দ চেতনা আর নিখুঁত ছন্দজ্ঞানই বা একালের কয়জন কবির ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে, আর অনুভবের এমন আন্তরিকতা ও প্রবলতা?

নির্যাতিতের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও ভালবাসা এক পরম আত্মিক সম্পদ। যে কবির মানসিক গঠনের মধ্যে এ জিনিস আপনা থেকেই আছে তাঁর আর লয়-ক্ষয় নেই; সেই জোরেই সেই কবি অনেকের মাথা ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠেন। লোক-দেখানো দরদের অনুশীলন করে একাধিক

কবিকেই আজকাল 'দরদী কবি' পরিচয়ে পরিচিত হতে দেখি কিন্তু যে-দরদ একেবারে সত্তার গভীরে নিহিত, রক্তের মধ্যে স্পন্দমান, তার জাত আলাদা। তার কোন exhibitionism-এর প্রয়োজন হয় না। সে যে স্বতঃই স্বপ্রকাশ। সুকান্তের ছিল এই ধরনের সহজাত দরদ, মজ্জাগত দরদ। সেই দরদকে তিনি তাঁর কবিতার ছন্দে ভাবে বাক্প্রতিমায় শব্দ সংস্কারে চারিয়ে দিয়েছিলেন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে নিছক প্রচারবাদী কবি অভিধায় অভিহিত করে নস্যাৎ করতে যাওয়া নিজেকেই নস্যাৎ করার তুল্য অসার ব্যায়াম।

আর নতুন ভাবের প্রতিই বা কারও কারও এত বিরাগ কেন? যুগে যুগে কবিতার বিষয়বস্তু পাল্টায়, কবির বিশ্বাসের ক্ষেত্র বদল হয়। যে যুগে যে ভাব সবচেয়ে প্রবহমান ভাবধারা রূপে প্রধানের মর্যাদা পায় ও যার অনুরণন আকাশে বাতাসে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে তার কবি প্রবক্তা দেখা দেবেই, তাঁর আবির্ভাব কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সাম্যবাদ এ যুগের একটি বিশিষ্ট চিন্তাদর্শন ও রাজনৈতিক কর্মপ্রণালী, তার প্রভাব জনমানসে উত্তরোত্তর বর্ধমান। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটবেই, আর সেই প্রতিফলন কোন না কোন কবির মাধ্যমে নিষ্পন্ন হবেই। সুকান্ত এই দায়টি নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন আর সে দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি তাঁর মূল্যবান জীবনটি পর্যন্ত তাঁর আদর্শের পায়ে ডালি দিয়ে গেছেন। তাঁর অকাল-বিয়োগ তাঁর গভীর আদর্শানুরক্তির প্রমাণ। তিনি যদি এ কাজ না করতেন তো আর কোন কবি এ কাজ করবার জন্য এগিয়ে আসতেন। কেননা ভাব কখনও শূন্যে বিরাজ করে না, তাকে ধারণ করবার আধার চাই। সুকান্ত এই রকম এক আধার ছিলেন। তিনি কবিতার শাশ্বত মূল্য অব্যাহত রেখে কবিতায় নতুন মূল্যবোধের পোষকতা করেছিলেন। কাব্যের চিরন্তন সৌন্দর্যের উপাসক হয়েও কাব্য বস্তুতে যুগোচিত ভাবগত পরিবর্তন সাধন করেছিলেন— বাংলা কাব্যের এ যাবৎ প্রচলিত বিশ্বাসের জগতে নতুন বিশ্বাসকে আবাহন করে এনেছিলেন।

এতো হতেই হবে, কবিতাকে যদি এগিয়ে চলতে হয়। ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর Illusion and Reality বইতে বলেছেন, কবি কাব্যের চিরন্তন অনুভূতিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নয়া অনুভবের প্রতি আকৃষ্ট হন। সুতরাং নয়া অনুভবটা কিছু দোষাবহ ব্যাপার নয় বরং সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য।

তাকে কাব্যের অগ্রগতির অনিবার্য নিয়ম বললেও চলে। আর কবিতায় রাজনীতি? সে কোন্ কবি না করেছেন এযাবৎ? পূর্বেই বলেছি যাঁর কবিতায় আপাত দৃষ্টিতে 'নস্টালজিক' ঘরে ফেরার সুর ছাড়া আর কিছু নেই বলে মনে হয় তাঁর কবিতায়ও সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে রাজনীতি আছে। সেটা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের রাজনীতি। রাজনীতি ছাড়া কি সাহিত্য হয়, কাব্য হয়? প্রসিদ্ধ রাজনীতিসচেতন কবি এবং রাজনীতির কারণে মৃত্যুবরণকারী শহীদ পাবলো নেরুদার কথায় পাই, যে লেখক রাজনীতি থেকে সরে আছেন মনে করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন তাঁর সেই আত্মপ্রসাদ একটা অলীক বস্তু (myth), পুঁজিবাদের দ্বারা এই অলীকতা উদ্ভাবিত ও পুষ্ট। কাজেই যুগসচেতনতা ও রাজনীতিসচেতনতা সুকান্তের কাব্যের কোন ব্যতিক্রমী লক্ষণ নয়, তা তাঁর কবিতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ও তাতে তাঁর রচনার গৌরব আরও বেড়েছে।

শক্তিমান ভাববাদী কবি এলিয়ট কবি·য় দুটি জিনিসের উপর জোর দিয়েছেন—আধুনিকতা ও ঐতিহ্য চেতনা। আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্য-চেতনা সমন্বিত হলে তবেই কাব্যসৃষ্টি সত্যিকারের জোর পায়। এই মানদণ্ডে বিচার করে দেখলে দেখতে পাবো সুকান্ত যথার্থ একজন আধুনিক কবি। ভাবের দিক দিয়ে তিনি আধুনিক, প্রকাশ শৈলীর দিক দিয়ে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ঐতিহ্যবান শিল্পী। তাঁর গোটা শিল্পের ইমারৎ ঐতিহ্যের বুনিয়াদের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত (যথা, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, এবং একালের বিমলচন্দ্র ঘোষ) বাদ দিলে, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের সুফল এমন সার্থকভাবে আত্মসাৎ করতে আর কোন রবীন্দ্রোত্তর কবি পেরেছেন বলে আমি জানি না। অথচ সুকান্ত এই কাজটি সমাধা করেছিলেন নিতান্ত কিশোর বয়সে—সে এক বিস্ময়কর উদাহরণ। অন্যান্য যাঁদের নাম করলুম তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন প্রবীণ কবি, দু'তিনজন সুনিশ্চিতরূপে বর্ষীয়াণ তো বটেই। তাঁরা তাঁদের বয়সের অভিজ্ঞতার প্রসাদে এবং দীর্ঘকালব্যাপী অনুশীলনের দৌলতে বাংলা কাব্যের শতাব্দীসঞ্চিত ঐতিহ্যের গুণগুলি আয়ত্ত করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সুকান্তের সামনে সেরকম কোন সুযোগ ছিল না। বয়স এক্ষেত্রে তাঁর মস্তবড় প্রতিবন্ধক ছিল। অথচ এমন পরিণত ছন্দের কান, নিখুঁত শব্দচেতনা ও মিলের সংস্কার তিনি কেমন করে আয়ত্ত করতে পারলেন

আমার কাছে আজও পর্যন্ত সেটা একটা অমীমাংসিত ধাঁধাঁ হয়ে আছে। অবিশ্বাস্য তাঁর কাব্যের আঙ্গিকের maturity, উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে ইংরেজী কথাটাই ব্যবহার করলুম, তবে কী বলতে চাচ্ছি তা আশা করি অস্পষ্ট থাকেনি। এমন পরিণত সুছাঁদ, সুবিন্যস্ত কবিতার অবয়ব গড়ে তোলা তাঁর বয়সের কবির পক্ষে তো বটেই তাঁর তিনগুণ বয়সের কোন কবির পক্ষেও বিরলদৃষ্ট এক সিদ্ধি।

প্রতিভার ব্যাখ্যা ছাড়া এই দুর্লভ শিল্পকৃতিত্বের আর বুঝি কোন ব্যাখ্যা চলে না।

অথবা প্রতিভার প্রসঙ্গ তুলে আমি বোধ হয় আমার নিজেরই অনভিপ্রেতক্রমে সুকান্তের এই বিরল কৃতির কারণ সন্ধান করতে গিয়ে তার ভিতর জাদু ক্রিয়ার ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে চলেছি—অলৌকিকতার সাহায্যে লৌকিব সংঘটনের ব্যাখ্যা খুঁজছি। সেটা ঠিক নয়। চেষ্টা করলে কি লৌকিব স্তরেই সুকান্তের অসাধারণ শিল্পসিদ্ধির একটা বস্তুগত কারণ খুঁজে পাওয় যায় না? তেমন চেষ্টাই এবারে আমি করবো।

২

মনে রাখতে হবে সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্ম পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন বৃত্তিতে পণ্ডিত ও যাজক, কিন্তু রাজধানী পরিবেশে তাঁর কৌলিক কর্ম ত্যাগ করে সংস্কৃত পুস্তক ব্যবসায়ে আত্মনিয়ো করেছিলেন। পরিবারের আবহাওয়ায় ছিল সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃ সচরাচর যে রকম শাস্ত্রচর্চার আবহাওয়া থাকে সেরকম নৈষ্ঠিকতার পরিমণ্ড —আচারবিশুদ্ধির ধ্যান ধারণা। অনুমান করা কষ্ট নয় ওই নৈষ্ঠিকত ও আচারবিশুদ্ধির অনেকটাই প্রথাবদ্ধতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল, রক্ষণশীলত বর্মে ছিল ঘেরা। এরকম একটি নিকষ পণ্ডিত পরিবারের সন্তান হয়ে সুকা কেমন করে কমিউনিস্ট হতে পেরেছিলেন সেও আর একটা মস্ত ধাঁধাঁ। কি এই ধাঁধাঁর নিরসন করা যায় বোধকরি এই চিন্তা করলে যে, চারপাশে বস্তুগত পরিবেশটাই মানুষের চিন্তা ও কর্মকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে, ত কৌলিক পরিবেশ নয়। কৌলিক বা পারিবারিক পরিবেশ বড়জোর ত মানসিক ছাঁচটিকে গড়ে তোলে, তার বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা বা স্থূলত দিক নির্ণয় করে; কিন্তু ওই মানসিকতা কোন্ প্রত্যয় বা ভাবাদ 'কে আ করবে তার হদিশ পারিবারিক উত্তরাধিকারের মধ্যে খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হ

হবে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে চারপাশের আবেষ্টনীর বৈশিষ্ট্যের ভিতর, সংশ্লিষ্ট মানুষটির শিক্ষাদীক্ষা, পড়াশুনো, বন্ধুনির্বাচন, মেলামেশা, বহির্বিশ্বের ঘটনার অভিঘাত ইত্যাদি বিচিত্র কারণ-পরম্পরার ভিতর।

আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে, সুকান্ত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা তাঁর পারিপার্শ্বিকের মধ্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর কৌলিক পরিবেশের ভিতর এর কারণ হাতড়াতে গেলে আমাদের অন্ধকারে হাতড়ানোই শুধু সার হবে। বরং এই ভাবাটাই সঠিক হবে যে, তিনি যে সংস্কৃত পণ্ডিত পরিবারের রক্ষণশীলতার পশ্চাৎটান সত্ত্বেও ওই টান কাটিয়ে নতুন কালের সবচেয়ে গ্রহণীয় ও বরণীয় রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শটিকে গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁর স্বভাবের অসাধারণ গ্রাহিষ্ণুতা ও পরিবেশ সচেতনতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। টুলো পণ্ডিতের ছেলের কী অসামান্য প্রগতিমুখী হওয়ার ক্ষমতা! ঘরের কুনো সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাইরের সুস্থ আলো-হাওয়াকে বুক ভরে নিতে পারার কী দরাজ দিল। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের আবির্ভাব পুরাকালে মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, আর এই কালে সুকান্ত বিস্ময় উৎপাদন করলেন নিকষ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে দীক্ষিত হয়ে। উপমাটা অবশ্য ঠিক খাটলো না, কিন্তু ঘুরিয়ে বললে খাটে। বহু মানুষের আজও এই ভ্রমাত্মক ধারণা যে সাম্যবাদ একটা দানবীয় মতবাদ। কেন দানবীয় মতবাদ, সবচেয়ে মানবিক মতবাদ কী করে দানবিক হয়, এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অবশ্য এঁদের খাবি খেতে হবে, কোন সদুত্তরই তাঁরা দিতে পারবেন না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে উল্টো উপমা, অর্থাৎ প্রহ্লাদকুলে দৈত্যের উপমা, বৈষ্ণবকুলে 'পাষণ্ডী'র আবির্ভাবের উপমা যদি কারও মনে জাগে তো তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না সম্ভবত।

কিন্তু সুকান্তের কবি হওয়ার মধ্যে কৌলিক উত্তরাধিকারের নিশ্চিত একটা ভূমিকা আছে। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে ভূমিষ্ঠ হওয়াটা তাঁর কবিজীবনের পক্ষে মস্ত বড় একটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। কেননা এই সূত্র থেকেই তিনি তাঁর কাব্যের ধ্বনির সংস্কারটি মূলতঃ আহরণ করেছিলেন। সুকান্তের কবিতা পড়লেই বোঝা যায় তিনি সংস্কৃত কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, সংস্কৃত কবিদের আচরিত ও অভ্যস্ত শব্দসংস্কার তাঁর হস্তামলকবৎ ছিল। তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিশিষ্ট বাঙালী পূর্বসূরী কবিদের রচনার মারফতে পরিশ্রুত

আকারে দুই-হাত ফেরতা ওই সংস্কারটি অধিগত করেছিলেন তা নয়, সরাসরিই তাকে অন্তরস্থ করেছিলেন সংস্কৃত কাব্য পরিচিতির সাক্ষাৎসূত্রে। গায়ত্রী মন্ত্র ও অন্যান্য সংস্কৃত স্তোত্র যা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে নিত্য উচ্চারিত, বেদের ঋক্, সূক্ত ও উপনিষদের শ্লোক, গীতার শ্লোকাবলীর ধ্বনিমাধুর্য, কালিদাস-ভবভূতি-মাঘ-ভারবি-ভর্তৃহরি প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিদের ছাড়া-ছাড়া ছেঁড়া-ছেঁড়া রচনাংশ, যা সংস্কৃত পুস্তক ব্যবসায়ীর গৃহে না চাইতেই সহজ প্রাপ্য, তার সঙ্গে কমবেশী পরিচিতি সঞ্জাত শ্রুতি মুখরতা নিশ্চয়ই সুকান্তের ধ্বনিবোধকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তা নয় তো চোদ্দ বছর কি তার কাছাকাছি বয়সের বালকের পক্ষে কেমন করে এমন নিখুঁত ছন্দ-মিল-ধ্বনি ও পরিণত ভাব সমন্বিত কবিতা লেখা সম্ভব হয় আমার অন্ততঃ তা ধারণায় আসে না। যথা,

সন্ধ্যার আকাশতলে পীড়িত নিঃশ্বাসে
বিশীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ম্লান হয়ে আসে।
বুভুক্ষু প্রেতেরা হাসে শাণিত বিদ্রূপে,
প্রাণ চাই শতাব্দীর বিলুপ্ত রক্তের—
সুষুপ্ত যক্ষেরা নিত্য কাঁদিছে ক্ষুধায়
ধূর্ত দাবাগ্নি আজ জ্বলে চুপে চুপে,
প্রমত্ত কস্তুরীমৃগ ক্ষুব্ধ চেতনায়
বিপন্ন করুণ ডাকে তোলে আর্তনাদ।

(নাম কবিতা, পূর্বাভাস)

এর প্রতিটি চরণের প্রতিটি শব্দ যথাযথ ওজন বিশিষ্ট, স্পষ্টার্থবোধক ও আপন আপন স্থানে সুপ্রযুক্ত। ধ্বনিগত শুদ্ধতার ও শব্দ গাম্ভীর্যের এক চমৎকার উদাহরণ। বয়সোচিত বিচ্যুতি যে নেই এমনও নয়, যেমন ষষ্ঠ চরণের 'ধূর্ত' কথাটিকে আধুনিক ছন্দের কায়দায় দুই অক্ষরের বদলে তিন অক্ষর হিসাবে ধরা হয়েছে, অথচ যুক্তাক্ষর ছন্দের রীতি অনুযায়ী তাকে দুই অক্ষর ধরলেই বোধ হয় ঠিক হতো। পয়ারের সেটাই নিয়ম। অথবা.

বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত.
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত,
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে. তন্দ্রাকে কর ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।

ঘরে তোল ধান, বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখ কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।
আজ দৃঢ় দাঁতে পুঞ্জিত হাতে প্রতিরোধ কর শক্ত,
প্রতি ঘাসে ঘাসে বিদ্যুৎ আসে জাগে সাড়া অব্যক্ত।

(উদ্যোগ—পূর্বাভাস)

এই তিন মাত্রার ছন্দের কবিতাটির ছন্দের মুন্সিয়ানা ও ধ্বনিসম্পদ প্রথম দৃষ্টান্তের চেয়েও চমকপ্রদ। কেননা, এতে শুধু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ত্রুটিহীন কারিকুরিই দেখানো হয়নি তার সংগে মিলের জাদুও যোগ করা হয়েছে। মিল শুধু চরণের অন্ত্যে নয়, চরণের অভ্যন্তর ভাগেও। অভ্যন্তর মিল আর অন্ত্য মিলে শ্রুতিসুখের ভুরিভোজ। এটি একটি প্রতিরোধের কবিতা, সেই নজীরে নিশ্চয়ই প্রচারধর্মী। কিন্তু প্রচারধর্মিতা কি কবিতাটির শিল্পমূল্যকে খর্ব করতে পেরেছে? আদৌ নয়। কেননা এটি ভাবের মহিমার দিক দিয়ে এবং ছন্দ ও মিলের নিটোলতায় আশ্চর্য একটি শিল্পকর্মের রূপ লাভ করেছে। ধ্বনির মাহাত্ম্য এই রচনাটির একটি লক্ষণীয় সম্পদ।

কিংবা পূর্বাভাস কাব্যগ্রন্থের আরও একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করা যাক কবির কিশোর কালীন পরিণত মননের তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসাবে ঃ

আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লীর ঝঙ্কারে,
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার অঞ্জন।

(আমার মৃত্যুর পর)

আঠার অক্ষরের পয়ার। নিখুঁত ছন্দোবন্ধ ও মিল। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সুপ্রয়োগের একটি অনবদ্য নমুনা। প্রসঙ্গত লিখি, ছ-সাত বছর পরেকার নিদারুণ শোকাবহ এক ঘটনার ছায়াপাতের কি কোন আভাস এই কবিতাটির মধ্যে মেলে? কে বলতে পারে বালক বয়সেই কেন এই মৃত্যু ভাবনা? মৃত্যুর চিন্তা সহজে লোকে করতে চায় না, এমন কি পরিণত বয়স্করাও তার প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে, এড়িয়ে চলে যদি কিছুকালের জন্য হলেও অনিবার্যকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। প্রসঙ্গ বর্জনের পিছনে থাকে এমনি ধরনের এক অসহায় মনোভাব। আর এই কবি কিশোর কিনা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে আপন মৃত্যুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে চোদ্দ পনেরোর কোঠা না পেরতেই। এই স্বেচ্ছা মৃত্যু ভাবনার মধ্যে কি মৃত্যু ভাবনা জয়ের কোন ইঙ্গিত নিহিত আছে?

মৃত্যুঞ্জয়িতারই কি তা কোনরূপ নিশানা ?

যে তিনটি উদাহরণ উপরে উৎকলিত হলো তা ইতস্ততঃ-চয়িত এমনি আরো অনেক উদাহরণ তাঁর রচনা থেকে দেওয়া যায় কবির সংস্কৃ ধ্বনিচেতনা বোঝাবার জন্য। সুকান্ত রচনাশৈলীতে রবীন্দ্রনাথে কাব্যাদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু তঁ কাব্যের জগৎ কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সীমিত ছিল না। তিনি রবীন্দ্রপূ বাঙালী কবিদের রচনাদর্শও বিলক্ষণ অনুশীলন করেছিলেন। আর সংস্কৃ কবিদের তো কথাই নেই, যে বিষয়টির একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

কবিরা বা সাহিত্যশিল্পীরা যে ঐতিহ্যের চর্চা করেন সেটা পূর্বসূরীদে ভাব বা ধারণা-কল্পনাকে অনুসরণ করবার জন্য নয়, তাঁদের ভাষা ও প্রকা শৈলীর রহস্য অবগত হবার জন্য, সম্ভবস্থলে আয়ত্ত করবার জন্য। কে আধুনিক লেখকই ভাবের জন্য পুরাতনের দ্বারস্থ হন না, তার জন্য তঁ সম্মুখে আধুনিক চিন্তার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। ভবিষ্যৎবীক্ষ অর্থাৎ ভবিষ্যতের চিন্তা-কল্পনাও তাঁকে এইক্ষেত্রে অনেকখানি পরিমাণে চালি করে। ভাবের নবীনত্ব কখনও পুরাতনের ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করা য না. গেলেও কালে-ভদ্রে, দৈবাৎ, চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তিতে উদ্ভাসিত আকস্মি এক প্রেরণার ন্যায়। ভাবের নবীনতা তথা মৌলিকতা তথা বৈপ্লবিকত জন্য বর্তমান কিম্বা অনাগত যুগের শরণ নেওয়াই সচরাচর পন্থা। কিন্ত প্রকাশের আঙ্গিক আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে পুরাতনের অনুশীলন করতে হবে, এর আর চারা নেই। সাহিত্য সংসারে একটা কথাই প্রচলিত আ যে, ভাষাপ্রকরণের উপর বিধিমতে অধিকার অর্জনের জন্য ক্লাসিকের শরণাপ হতে হবে, আর ভাবের নাবীন্যের জন্য চারপাশের পৃথিবীর সমসাময়ি ভাবধারার সান্নিধ্য চর্চা করতে হবে। পুরাতন ভাষারীতি আয়ত্ত ক দরকার প্রকাশের শক্তি অর্জন করবার জন্য, আর কোন কারণে নয়। বাংল আধুনিককালের কোন কবি যদি মনে করেন তিনি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদ মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস এবং আধুনিককালের রঙ্গলা মধুসূদন-হেম-নবীন-বিহারীলাল-অক্ষয়বড়াল দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ প্রম বাংলার দিক্‌পাল কবিদের কাব্যশৈলীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত না হ আধুনিক কাব্যের আসর মাত করবেন তাহলে তাঁর মত ভ্রান্তব্যক্তি ত কেউ নেই। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর কাব্যে ভাবের যত নবীনতারই আমদা করুন-না কেন, প্রকাশশৈলীর দুর্বলতার কারণে, ধ্বনির দারিদ্র্য আর ছন্দে

পঙ্গুতার জন্য তাঁর রচনা বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যাবেই। আমাদের একালের কবিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই তাঁদের কাব্য জীবনের প্রাথমিক পাঠ নেন জীবনানন্দ আর সুধীন্দ্রনাথ আর অমিয় চক্রবর্তী আর বিষ্ণু দে প্রমুখ আধুনিক কবিকুলের উদাহরণ থেকে, যে কারণে তাঁদের রচনা কোন সময়েই তাদৃশ জোরালো হয় না, ভাবের নবীনত্ব সত্ত্বেও ভাষাপ্রকরণ আর শব্দসংস্কারের ত্রুটির জন্য তাঁদের রচনা প্রায়শঃ মাঠে মারা যায়।

এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে, পুরাতনের চর্চা করলে পুরাতনের দ্বারা গ্রাসিত হওয়ার আশংকা থাকে। তেমন ক্ষেত্রে পুরাতন পৃথিবীতে যে-পরিমাণে হারিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে সে-পরিমাণে নাকি নূতনের সহিত সংযোগ-রাহিত্যের ভয় দেখা যায়। মোটেই ঠিক নয় কথাটা, বরং উল্টো। পুরাতনের চর্চা করা দরকার পুরাতনের অস্ত্রে পুরাতনকে ঘায়েল করবার জন্য। মধুসূদনকে জানতে হবে মধুসূদনের ভাবের জগৎ ছিন্নভিন্ন করার জন্য, বিহারীলালের অনুশীলন প্রয়োজন তাঁর বাস্তবচেতনাবিবর্জিত একান্তকল্পনানির্ভর মৃদু-মোলায়েম-সংগ্রামবিমুখ গীতলতার (lyricism) সংস্কারটি নির্জিত করবার জন্য। কিন্তু কবিতার ফর্ম এর ঔজ্জ্বল্য বিধানের জন্য এঁদের কাব্যরীতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় অবশ্যই প্রয়োজন। বাংলা কবিতার ধ্বনির সম্পদকে সমৃদ্ধ করবার জন্য সংস্কৃত কাব্যচর্চাও অপরিহার্য।

কবি সুকান্তের কাব্যের বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি ভাবের দিক দিয়ে একালের সবচেয়ে আধুনিক, প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক প্রত্যয়ের চর্চা করেছিলেন; তাই বলে তিনি ঐতিহ্যের চেতনা থেকে বিযুক্ত ছিলেন না, বরং আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম যুগের আরেকজন বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদনের মতই ঐতিহ্যের উৎস থেকে বারে বারে অঞ্জলিভরে ধ্বনির রস পান করেছিলেন; ভাষা ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত নিবিড় ছিল বলেই তাঁর কবিতার শিল্পরূপ এত পরিচ্ছন্ন, এত নিটোল, এত উজ্জ্বল হতে পেরেছিল। মায়ের কোলে তিনি রামায়ণ মহাভারত শ্রুতিপ্রসাদাৎ, ভাল করে রপ্ত করেছিলেন, আরও বড় হয়ে পারিবারিক আবহাওয়া থেকে সংস্কৃত স্তোত্র-মন্ত্র-শ্লোক ও কবিতার ধ্বনির নির্যাসটি অন্তরস্থ করেছিলেন, কিশোর বয়সে রবীন্দ্রকাব্য বিধিমতে আত্মগত করেছিলেন—এত সব স্মৃতি, শ্রুতি ও মননের সম্মিলিত প্রভাবেই না সুকান্ত সুকান্ত হতে পেরেছিলেন। নিছক কম্যুনিস্ট কবি বলে কি তাঁকে উড়িয়ে

দেবার কোনরূপ উপায় আছে? কবিতার বিশুদ্ধ শিল্পমূল্যের দিক দিয়ে যদি তাঁর কাব্যের বিচার করা যায় তাহলেও দেখা যাবে নূতন পুরাতন অনেক কবির মাথাই তিনি ছাড়িয়ে আছেন। কিশোর কবি হয়েও তিনি অত্যন্ত পরিণত আঙ্গিক ও পরিণত মননের কবি; কমুনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েও তিনি কমুনিস্ট প্রচারকেই তাঁর কবিতার একমাত্র উপজীব্য মনে করেন না, তাঁর শিল্পসৌন্দর্যের প্রতিও সমান অবহিত ও সমান যত্নপরায়ণ; আর নূতনের উদগাতা হয়েও পুরাতন বা ঐতিহ্যের যে-অংশ থেকে শক্তি-আহরণ করা যায় তার প্রতিও তিনি উদাসীন নন। সুকান্ত এক অসামান্য শক্তিশালী কবি।

৩

সুকান্তের কবিতার আঙ্গিকগত উৎকর্ষ ও পরিণত কলাজ্ঞান সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করেছি, এবারে তাঁর কবিতার ভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

সুকান্তের কবিতার পরিণত ধ্বনিচেতনার পাশে পাশে সর্বত্রই দেখা যায় সেই ধ্বনির সমানুপাতিক আবেগের প্রগাঢ়তা। বস্তুতঃ, কবির আবেগের প্রগাঢ়তা থেকে তাঁর কাব্যের ধ্বনিসম্পদের সৃষ্টি। একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই ওতপ্রোত সম্পর্কের প্রকৃতি এরূপ যে, এমন বিপরীত কথা পর্যন্ত কখনও কখনও মনে হতে পারে যে কবিতার ধ্বনিসমৃদ্ধিই বুঝি তাঁর ভাবাবেগের ঐশ্বর্যের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তা তো হয় না। ভাবকে বাদ দিয়ে রূপের আশ্রয় নেই। রূপের মূলে ভাবের দ্যোতনা অবশ্যই থাকা চাই, তা নয় তো রূপ দাঁড়াতে পারে না, খুলতে পারে না। সুকান্তের কবিতায় আবেগ যেন থম্ থম্ করছে, আর সেই গভীর ভাবাবেগই কাব্যভাষায় পরিশ্রুত হয়ে ধ্বনিগত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করেছে। এই মানদণ্ডে বিচার করে বলতে হয় তাঁর কাব্যের অসামান্য শব্দচেতনা, ছন্দ ও মিলের কারুকার্য, শিল্পশৈলীর পারিপাট্য ও খুঁতহীনতা, এককথায় তাঁর বিস্ময়কর ধ্বনিসম্পদ তাঁর অনুভব ও কল্পনার গভীরতার রূপান্তরিত বেশ মাত্র। কাব্যের 'আত্মা' এক্ষেত্রে কাব্যের উপযুক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত।

সুকান্তের অনুভব ও কল্পনা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দিকে প্রধাবিত হয়েছিল। নির্যাতিত ও শোষিতের প্রতি সহজাত সমবেদনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সুতীব্র রোষ ও ঘৃণা

জনজাগরণের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ও জনগণের শত্রুদের নির্মূল করবার জন্য সতত উচ্চারিত আহ্বান ঘোষণা, বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস বোধ, ফ্যাসিবাদী হিংসা, লোভ ও ক্রূরতার প্রকৃত স্বরূপের চেতনা ইত্যাদি এবং এই রকমের আরও কিছু বিষয় তাঁর কবি-কল্পনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। হয়ত এই সব বিষয়ের তাৎক্ষণিকতার প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টির ক্ষমতার জন্য তাঁর কাব্য ভাবনা একান্তভাবে এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে কিন্তু তার মানে এ নয় যে তিনি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অচেতন ছিলেন। ইচ্ছা করলে যে তিনি জনগণের কবি পাবলো নেরুদার মত প্রেমের কবিতাও লিখতে পারতেন তার প্রমাণ 'প্রিয়তমাসু' 'অবৈধ' 'রৌদ্রের গান' (ঘুম নেই), 'স্মারক' (পূর্বাভাস) প্রভৃতি কবিতার মধ্যে তিনি উজ্জ্বল অক্ষর লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু যেহেতু অত্যাচারীর শোষণ বঞ্চনা ও নির্যাতন দমনের কাজে মুহূর্তেকের বিলম্বও সওয়া উচিত নয় এবং জনসাধারণের দারিদ্র্যমুক্তি একদিনও পেছিয়ে রাখার মত কর্মসূচী নয়, সেই কারণে তাঁর সমস্ত আবেগ একত্র সংহত হয়ে সর্বাত্মক প্রবলতা নিয়ে কেবলমাত্র ওই সব বিষয়ের অভিমুখেই বারে বারে ছুটে যেতে চেয়েছে। এতে হয়ত কল্পনার ব্যাপ্তি কিছু সংকুচিত হয়েছে, অনুভবের বহুমুখীনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তার ফলে বক্তব্যের মধ্যে এসেছে কেন্দ্রাভিগতার তীব্রতা, একমুখীনতার প্রগাঢ়তা। জনমানুষকে ভালবাসার মূল্য হিসাবে এইজন্য কবি হিসাবে সুকান্তকে যে কতখানি আত্মত্যাগের মাশুল গুণে দিতে হয়েছে তার সন্ধান আর কয়জনা রাখেন? সুকান্ত জেনেশুনে, একটি সচেতন প্রক্রিয়ার অঙ্গরূপে, কবির সর্বত্রগামিতার শক্তিকে, বিষয়ের নানামুখীনতাকে জনদরদের বেদীমূলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ স্বার্থত্যাগের কি কোন তুলনা আছে? মানুষের সেবায় ও ভালবাসায় একান্তভাবে যে কবির চিত্ত অধিকৃত, সেই কবির অন্যাবিধ হওয়ার উপায় নেই। কবিত্বের সর্বত্রসঞ্চারী প্রতিভা তো বটেই, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত জনগণের জন্য উৎসর্গ করে সেই কবির ক্ষান্তি ও ছুটি। সুকান্ত নিজ জীবনেই এই দুই ধরনের আত্মোৎসর্গের পরিচয় বিধিমতে রেখে গেছেন।

'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের 'বোধন' কবিতাটিকে সুকান্তের স্বল্পস্থায়ী কিন্তু প্রবলভাবে সোচ্চার কবিজীবনের 'টেস্টামেণ্ট' স্বরূপ জ্ঞান করা যেতে পারে। এই কবিতাটির মধ্যে তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনের মূলসূত্রটি নিহিত আছে। উপরে সুকান্তের কবিতার যে সব ভাববৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছি

কয়টি বৈশিষ্ট্যই এই রচনাটিতে কোন না কোন ভাবে বিধৃত আছে। তবে সবচেয়ে প্রকট হয়েছে অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা। অত্যাচারিতদের দুঃখে যখন তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে তখন একই সঙ্গে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি তীব্রভাবে ফুঁসে উঠছেন। তাঁর একচোখে রয়েছে কান্না, অন্য চোখে জ্বলছে বজ্রাগ্নিজ্বালা। সেই প্রচণ্ড দাহেরই বহিরভিব্যক্তি নীচের পঙক্তিগুলি :

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার ?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কবি তথাকথিত অহিংসার সার্থকতায় বিশ্বাস করেন না, প্রয়োজনে হিংসার শরণ নিতে তাঁর বিবেক আদৌ কুণ্ঠিত নয়, যদি তার দ্বারা অত্যাচারীকে শায়েস্তা করা সম্ভব হয়। 'অহিংসা'র প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ তাঁর আরও কবিতায় দেখা যায়। সেই সঙ্গে ক্ষমার মাহাত্ম্যের প্রতি সংশয়। ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রাক্ষেত্র বিবেচনা ক্ষমার মাহাত্ম্য সূচনা করে, নির্বিচার ক্ষমা দুর্বলতারই নামান্তর। সেই কথারই ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে ওই একই বোধন কবিতার পূর্বাংশের নীচের চরণগুলিতে :

তবু আজো বিস্ময় আমার
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।
তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্ত কক্ষতে জমায়
তাদেরি দুপায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায় ;
... .
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।

তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ শূন্য মাঠে কঙ্কালকরোটি
তোমাকে বিদ্রূপ করে,.........

উদ্ধৃতি দেওয়ার যথেষ্ট অবকাশ আছে, কিন্তু উদ্ধৃতি দিয়ে সমালোচনা-প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। শুধু পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই।

সুকান্তের 'ঐতিহাসিক' কবিতাটির শেষাংশের ব্যাখ্যায় ভাববাদী কাব্য-সমালোচকেরা তার ভিতর শাশ্বত ভাবের সন্ধান পেয়েছেন, চিরন্তনতার দ্যুতিতে নাকি লাইনগুলি প্রোজ্জ্বল। কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে লাইনগুলির মাধ্যমে কবি এই বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চেয়েছেন যে, সত্যের দ্যোতনা প্রাচীন মূল্যবোধগুলির ঝুড়িতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে আধুনিক সমাজবাদী প্রত্যয়ের মধ্যে, যার জন্মদাতা কার্ল মার্কস, কোন অতীতকালীন ঋষি নন। লাইনগুলি এই—

আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে, অনেক অনেক দেরি।
আর মনে করো আকাশে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের কথা,
আর আছে চিরকালের আবর্তন ॥

এখানে 'ধ্রুব নক্ষত্র' বলতে বোঝাচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী প্রত্যয়; 'নদীর ধারায় গতির নির্দেশ' বলতে বোঝাচ্ছে ইতিহাসের অনন্ত প্রবহমানতা; 'অরণ্যের মর্মরধ্বনি' বলতে বোঝাচ্ছে কবির নিজেরই কথায় 'আন্দোলনের ভাষা,' অর্থাৎ শ্রেণী-আন্দোলনের ভাষা, আর পৃথিবীর 'চিরকালের আবর্তন' বলতে বোঝাচ্ছে ইতি-নেতি-সংশ্লিষ্টির দ্বন্দ্বভঙ্গিমায় ইতিহাসের চিরজঙ্গমতা। অর্থাৎ মার্কসীয় ডায়লেকটিকস তত্ত্বই এই কয়টি পঙ্‌ক্তির মূল উপজীব্য। এর ভিতর ভাববাদী-সুলভ চিরন্তনতার মহিমা আবিষ্কার করতে যাওয়া বৃথা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপর্বের ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের রচনা আর উত্তর পর্বের রচনার মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। বিশেষ করে তাঁর ছোট গল্পগুলির বেলায় এ পার্থক্য আরও বেশী প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের প্রথম পর্ব বলতে আমরা বুঝি ১৯২৮ সাল (যে বৎসরে তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'অতসীমাসী' প্রকাশিত হয়) থেকে ১৯৪৩-৪৪ সাল এই কম বেশী পনেরো-ষোল বছরের রচনাকাল আর উত্তর পর্ব বলতে বোঝায় ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৬ পর্যন্ত তাঁর জীবনের শেষ বারো-তেরো বছর কাল। এই দুইপর্বের রচনার ধারার মধ্যে শুধু বিষয়গত পার্থক্যই নয়, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও অতিশয় স্পষ্ট। উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই যেন এ পার্থক্য অধিকতর সোচ্চার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার বেলায় এমনতর পর্ববিভাজনের কারণ কী? কারণ এই যে, দুটি সুস্পষ্ট পৃথক মনোভঙ্গী, পৃথক শুধু নয় বিপরীত মনো-ভঙ্গী তাঁর এই দুই পর্বের রচনারীতির মূলে সক্রিয় থেকে তাদের এক থেকে অন্যটিকে বিশ্লিষ্ট করে দিয়েছিল। প্রথম পর্বের ছোটগল্পে তিনি ছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অন্তর্নিবেশী, আত্মরতিমূলক বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, জটিল ও মর্বিড; আর শেষ পর্বের রচনায় তিনি হয়েছিলেন বহির্মুখ, সামূহিক চেতনায় দীপ্ত, সহজ ও অজটিল রচনা রীতির পক্ষপাতী, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শিল্পী। প্রথম বয়সের লেখায় বর্ণিত চরিত্রগুলির মনোজীবনকে কেন্দ্র করে তাদের অসুস্থ কামনা বাসনা ও নির্জ্জান মনের কারিকুরিকে জটিল রীতিতে রূপ দেওয়াই ছিল তাঁর কথাশিল্পের লক্ষ্য; আর শেষ বয়সের রচনায় তিনি ক্রমশঃ অন্তর্নিবেশ তথা নির্জ্জান নিরীক্ষণের অভ্যাস ত্যাগ করে মনুষ্য জীবনের বাইরের কর্মকাণ্ডকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ঐ সব কর্মকাণ্ডকেও আবার ব্যক্তির একক জীবনের স্তরে রূপ দেননি, রূপ দিয়েছেন সামূহিক স্তরে অর্থাৎ সমষ্টি জীবনের সীমায়। কোন একজন বিশিষ্ট সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন তা ছিল "জটিল ও কুটিল"।

এই বিশ্লেষণ মানিকের প্রথম জীবনের লেখা সম্পর্কে সর্বাংশেই প্রযোজ্য বলা যায় কিন্তু পরবর্তী জীবনের রচনার ধারা সম্পর্কে বলা যায় কিনা সন্দেহ।

কেননা এই পর্বে মানিক অত্যন্ত সচেতনভাবে কুটিল মননের অভ্যাস পরিহার করেছিলেন, তার জায়গায় সোজা সরল ঋজুরেখ, এমনকি চাঁচাছোলা রচনা-রীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তির নির্জ্জন মনের অন্ধকারে সাঁতার কেটে তিনি আর আগের মত তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না, বারে বারে তাঁর কল্পনা বাইরের রৌদ্রালোকে ভেসে উঠতে চেয়েছে এই অধ্যায়ে, আর সেই রৌদ্রালোকও কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সীমানায় সীমিত নয়, গণজীবনের সুপ্রশস্ত পরিসরে বিস্তৃত। যে-গণজীবন তিনি তাঁর শেষ পর্বের গল্পোপন্যাসে চিত্রিত করেছেন তা কিন্তু শোষক ও বঞ্চকের সকল অত্যাচার মুখ বুজে সওয়া নির্বিরোধ গণজীবন নয়, পক্ষান্তরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাতে সমুজ্জ্বল গণজীবন।

এ দেশের সাধারণ মানুষ বলীর দর্পের কাছে বিনা আপত্তিতে মাথা নোয়ানোকেই তাদের নিয়তি বলে জানে, অত্যাচারীর প্রবল পরাক্রমের মুখে পড়ে পড়ে পড়ে মার খাওয়াকেই তাদের অপরিবর্তনীয় ভবিতব্য বলে জ্ঞান করে। কিন্তু মানিকএদেশের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষগুলির এইপুরাতন পরিচিতগতানুগতিকছকটিকে একেবারে উল্টে দিয়েছেন তাঁর শেষ বয়সের গল্পগুলিতে। ব্যক্তিগত জীবনের স্তরে প্রতিকারবিহীন নিরুপায় তায় অযথা হা হুতাশ না করে সংঘবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাবানের কাছ থেকে দাবি আদায়ের চেষ্টা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত, নিজেদের ঐক্য শক্তিতে বিশ্বাস ও সংকল্পের দৃঢ়তা—এই সমস্ত বিভিন্ন লক্ষণে মানিকের শেষ বয়সের গল্পগুলি শুধু শিল্পকর্মই হয়ে ওঠেনি, সাধারণ মানুষের ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকারও একটা পথের হদিস হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই পর্বের গল্পে শিল্প ও কর্মিষ্ঠতার এক চমৎকার সমন্বয় দেখতে পাব, যা তাঁর আগের লেখায় কম বেশী অনুপস্থিত ছিল। মানিক এই পর্বের লেখায় শুধু সমস্যা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, সমস্যার, সমাধানেরও পথ বাতলে দিয়েছেন। এটা তাঁর সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটা নয়া সংযোজন—নয়া আয়তন।

এ কথা অবশ্য সত্য যে মানিক তাঁর জটিল মননের সংস্কার এই পর্বেও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি চেষ্টা করেছেন সহজ সরল হতে কিন্তু তাঁর মজ্জাগত স্বভাব-জটিলতা এই অধ্যায়েও কোন কোন গল্পে তাঁকে চিন্তার জটে অস্বচ্ছ করে রেখেছে। যেমন তাঁর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত 'কে বাঁচায় কে বাঁচে', 'সাড়ে সাত সের চাল', কিংবা 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্প

-গুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্প তিনটিতে ভাগ্যহত সাধারণ মানুষের অনশন ও ক্ষুৎপিপাসার বেদনা চমৎকার শিল্পরূপ লাভ করলেও মানিকের স্বভাবসিদ্ধ জটিল ও কুটিল মননের পশ্চাৎ টানের প্রভাব এখানেও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এমন কোন কোন গল্প আছে যেখানে তিনি এই জটিলতা কুটিলতার পেছুটান পুরোপুরি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন 'পেট-ব্যথা', 'মাসি পিসি', 'হারানের নাতজামাই,' 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী,' 'শিল্পী', 'আর না কান্না', 'টিচার' প্রভৃতি গল্প। এসব রচনায় মানিক আত্মখণ্ডন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার অন্ধকার গহন থেকে নিজেকে মোচন করে তিনি এখানে পুরোপুরি মাত্রায় ঘটনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছেন, হয়ে উঠেছেন বহির্মুখ, বস্তুনিষ্ঠ, অ্যাকশনধর্মী। চিন্তা থেকে কাজের জগতে উত্তরিত হয়েছেন। অযথা চিন্তা, অকারণ চিন্তা, এক কথায় চিন্তার আতিশয্য যে কোন কোন লেখকের রচনায় কখনও কখনও অসুস্থ মনোবিকারের কোঠায় গিয়ে পড়ে সেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বয়সের একাধিক গল্পোপন্যাসের ছাঁচ থেকে প্রমাণ করা যায়। এ কথার উদাহরণ স্বরূপে আমরা তাঁর 'দিবা রাত্রির কাব্য' উপন্যাসের হেরম্ব চরিত্র, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের শশী চরিত্র, 'প্রাগৈতিহাসিক', 'টিকটিকি', 'সরীসৃপ' 'কুষ্ঠরোগীর বউ' প্রভৃতি গল্পের বিষয়-বস্তু ও চরিত্রায়ণের উল্লেখ করতে পারি। মনোবিকলন অর্থাৎ মানুষের মনো-বিকারের চিকিৎসক সুলভ ব্যবচ্ছেদী বিশ্লেষণে মানিকের এক অদ্ভুত উল্লাস ছিল, যার অসুস্থ প্রভাব তিনি ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠে এক সময়ে সুস্থতার জগতে পদার্পণ করেছিলেন। প্রথম যুগে রচিত 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলিতে কিংবা সরীসৃপ কিংবা টিকটিকি গল্পতে তিনি যে মর্বিড মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন শেষের যুগের লেখা মাসি পিসি কিংবা হারানের নাতজামাই কিংবা পেটব্যথা গল্পে তাঁর ছিটেফোঁটা অবশেষও আর নেই। কেমন করে মানিকের শিল্পী জীবনে এই অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হলো সেটা একটা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়।

পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করতে বসে প্রথমে যে কথাটা মনে উদয় হয় তা হলো মানিক তার কম বেশী সিকি শতাব্দী কাল স্থায়ী সাহিত্য জীবনে দুটি দৃষ্টিগ্রাহ্য আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে ফ্রয়েডীয় মনো-বিকলনের আদর্শের দ্বারা; উত্তর জীবনে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা। মানিক যে পরিমাণে ফ্রয়েডীয় ব্যক্তিতন্ত্র ও আত্মকেন্দ্রিকতার অভ্যাস থেকে দূরে সরে গিয়ে মার্কসীয় চৈতন্যের ভাববৃত্তের মধ্যে আপনাকে ধরা দিয়েছেন, সেই

পরিমাণেই তাঁর লেখা ক্রমসুস্থ, ক্রমবহির্মুখী, ক্রমসমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছে। তাঁর আত্মরতির মারাত্মক স্বভাব কেটে গেছে, দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে উত্তরোত্তর মাত্রায় সমষ্টিচেতনা, ঘটনাজীবিতা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আবেগ। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে যত বেশী সজাগ হয়েছেন তত তাঁর কলম ধারালো হয়ে উঠেছে, কলমের মুখে জেগে উঠেছে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের আকুতি। কোথাও কোথাও এই আকুতি বিদ্রোহের সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। যেমন মাসিপিসি. হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা প্রভৃতি গল্পে। আমরা যদি সরীসৃপ আর টিকটিকি গল্পের জগৎ থেকে ওই তিন পূর্বোক্ত নামীয় গল্পের জগতের অভিমুখে রওনা হই তবে দেখব পথ অত্যন্ত দীর্ঘ বিসর্পিত, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত সাদা চোখে ঠাহর করা যায় না। দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তকে আলাদা করে রেখেছে। টিকটিকি গল্পে মর্বিডিটির চূড়ান্ত করে ছাড়া হয়েছে। সরীসৃপ গল্পে দুই মায়ের পেটের বোনের একের প্রতি অপরের যে উৎকট ঈর্ষা বিদ্বেষ ও সর্বনাশা জিঘাংসার পরিচয় মেলে তেমন ব্যাপার একমাত্র অসুস্থ মনোবিকারের জগতেই ঘটা সম্ভব। পক্ষান্তরে মাসিপিসি, হারানের নাতজামাই কিংবা পেটব্যথা গল্পে এমনতর মনোবিকারের লেশমাত্র নেই, বরং আছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্র। এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এসেছে জনজীবনের সঙ্গে একাত্মতার সূত্রে। মনোবিকলন সর্বদাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অন্তর্নিবেশমূলক; পক্ষান্তরে বহির্মুখীনতা, ঝোঁকের তারতম্য অনুযায়ী, সর্বদাই সমষ্টিজীবনের সঙ্গে যুক্ত। যতদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক রীতির হাতে ধরা হয়ে চলেছিলেন ততদিন মানুষের সমষ্টিজীবনের সুখদুঃখ তাঁর চোখের আড়ালে ছিল; এই পর্বে তিনি কেবলই, অন্তহীন পরিক্রমায়, নিজের ও অপরের নির্জ্ঞান ও অর্ধজ্ঞান মনের গভীরে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে লোকের অসুস্থ মানসিকতার তত্ত্ব খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলেন। নয়তো টিকটিকির মত গল্প লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। সেই মানিকই কিনা পরে লিখলেন জনসাধারণের প্রতিরোধমূলক একাধিক উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। যখন থেকে তার শিল্পদৃষ্টিতে আত্মকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটে সামূহিক চেতনার বিজয় ঘোষিত হলো তখন থেকেই তার শিল্পদৃষ্টি প্রকৃত অর্থে খুলে গেল। এ যে কত বড় বিবর্তন তার আন্দাজ পাব যদি মনে রাখি যে ফ্রয়েড আর কার্ল মার্কস একে অন্যের থেকে দুই দূরতম প্রস্থান বিন্দু। দুইয়ের

বিচরণ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফ্রয়েডীয় ও মার্ক্সীয় দর্শনের যুগ্ম পরিণাম ফল বলে মনে করেন। এ কথা ঠিক নয়। তার সাহিত্য জীবনে ফ্রয়েড আর মার্ক্স দুইয়েরই প্রভাব স্বীকৃত, তবে এককালীন নয়। এই দুইয়ের প্রভাব তাঁর জীবনে বর্তিয়েছিল পর্যায়ক্রমে—পরে পরে, সম সময়ে নয়। প্রথম বয়সে ফ্রয়েডীয় আত্মরতির মাত্রাহীন প্রভাব; পরে ফ্রয়েডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে মার্ক্সীয় চিন্তা চৈতন্য। অবশ্য কিছু কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প রয়েছে যার মধ্যে এই দুই দৃষ্টিকোণেরই যুগপৎ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; যেমন 'দর্পণ' ও 'অহিংসা' উপন্যাস, ছোটগল্পের ভিতর কে বাঁচায় কে বাঁচে, হলুদ পোড়া, ছিনিয়ে খায় নি কেন প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। হলুদপোড়া গল্পে একটি গ্রাম্য কুসংস্কারকে (লোকের উপর ভূতের ভর হওয়া ও ওঝার চিকিৎসায় সেই ভূতঝাড়ানোর চেষ্টা) এক হাত নেওয়া হয়েছে কিন্তু ওই কুসংস্কারের এখনও যে কতখানি জোর বিদ্যমান তাও দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ সমালোচনা সত্ত্বেও গল্পটির মধ্যে বাস্তববোধ বিলক্ষণ মাত্রায় বর্তমান, তেমনি বাস্তববোধ ছড়িয়ে আছে ছিনিয়ে খায়নি কোন গল্পে। দুর্ভিক্ষের বাজারে ব্যবসায়ীদের গুদামে ও দোকানে খাদ্য থরে থরে সাজানো থাকা সত্ত্বেও বুভুক্ষু অভাবগ্রস্ত মানুষেরা কেন খাদ্য লুঠ করে খায়নি তার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গল্পে। রচনাটিতে সমালোচনা আছে কিন্তু বিদ্রোহ নেই। বিদ্রোহের ধার ভোঁতা হয়ে গেছে যারা বিদ্রোহ করবে, খাদ্য লুঠ করে খাবে, তাদের নির্জীবতায়, প্রাণশক্তির অভাবে। দুঃশাসনীয় গল্পটিও একটি ব্যর্থতার গল্প। চমৎকার শিল্পরচনা কিন্তু ট্রাজিডির বেদনায় গল্পের রস স্বতঃই করুণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় চাল চিনি কেরাসিনের মত বস্ত্রের সংকটও অতিশয় উৎকট হয়ে উঠেছিল। সেই বস্ত্রের সংকট এই গল্পের বিষয়বস্তু, গল্পের নাম থেকেই যার আন্দাজ পাওয়া যায়। গল্পের শেষটি এত ব্যথাময় যে বঞ্চক বস্ত্রচোরদের বিরুদ্ধে তীব্র রোষও চোখের জলে গলে যায়। রাবেয়ার জলে ডুবে আত্মহত্যা সমস্ত গল্পটির উপর একটা গভীর বিষাদের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। বস্ত্রের কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও আক্রোশ প্রকাশের কথাটা যেন মনে হতেই চায় না এমনি বিষাদের নিবিড়তা।

এখানে বলবার কথা এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন পর্যন্ত ফ্রয়েড-

বাদ আর মার্কসবাদ এর সীমান্ত-রেখায় দুলছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর লেখায় প্রতিবাদ আর প্রত্যাঘাতের চেতনা তরবারির শাণিত ধারের মত ঝলসিত হয়ে ওঠেনি, শ্রেণী সংঘর্ষের তত্ত্বকে তখনও তিনি সার্থকভাবে রূপ দিতে পারেন নি। কিন্তু যখন থেকে মার্কসবাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা ও বৈজ্ঞানিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইলো না তখন থেকেই তাঁর লেখার আর একরূপ—কি গল্পে কি উপন্যাসে। খাপখোলা তলোয়ারের মতই সে রূপের ঔজ্জ্বল্য ও ধার। মানিক যেদিন থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকাতলে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়ালেন, সেদিন থেকে তাঁর মন হতে ফ্রয়েডীয় অপঃত্ত্বের মোহ নিঃশেষে ঝরে গেল। মার্কসবাদের পাশে ফ্রয়েডবাদ একটা অশ্রদ্ধেয় দর্শন ভিন্ন আর কিছু নয়, ওটা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা কৌশলী হাতিয়ার। ব্যক্তির অচেতন মনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে তা সমাজে যৌথ মনের চেতনাকে আড়াল করে রাখতে চায়। শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা এ বলে না, কেবলই নির্জ্ঞান ও চেতন মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলে মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। মানিক প্রথম জীবনে এই বিভ্রমের কুহকের মধ্যে পড়েছিলেন আমাদের 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের দেখাদেখি। ফ্রয়েডকে গুরু মানা তখনকার কালের সাহিত্যিকদের একটা ফ্যাসান ছিল। মানিকও ওই ফ্যাসানের খপ্পরে পড়েছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান, সেই হেতু এই ফ্যাসানই তাঁর হাতে হয়ে উঠেছিল ক্ষুরধার এক ব্যবচ্ছেদী শলাকা, যা চিরে ফেঁড়ে মানুষের মনকে ফালাফালা করে দেখে অদ্ভুত এক আনন্দ পায়। কিন্তু এই আবেশ মানিকের লেখায় অনেককাল স্থায়ী হলেও চিরস্থায়ী হয়নি। মার্কসবাদী প্রত্যয় মধ্যপথে এসে তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। মানিক, সাহিত্য জীবনের চলার পথে মার্কসবাদী বিজ্ঞানের আশ্রয় পেয়ে পুরনো পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। নতুন মানুষ—নতুন লেখক।

॥ ২ ॥

মাসিপিসি মানিকের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প। সাধারণ মানুষের অন্তরে অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধের চেতনা কতটা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারে এই গল্পটি তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। উদাহরণটি দুটি আপাত অসহায় গ্রামীণ নারীর জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে বলে তার ফলোপযোগিতা আরও বেড়েছে। নেশাখোর অত্যাচারী স্বামীর হাতে পড়ে আহ্লাদীর দুর্দশার আর

সীমা পরিসীমা ছিল না। বাপের বাড়িতে কেউ নেই, দুর্ভিক্ষে সব হেজেমে গিয়েছে, থাকবার মধ্যে দুই প্রৌঢ়া বিধবা—আহ্লাদীর মাসি আর পিসি দুটিতে গায়ে গতরে খেটে সংসারটি কোনমতে টিকিয়ে রেখেছে, নিজেদের একটা হিল্লে তাতে হয়েছে। একদিন স্বামীর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরম আহ্লাদী বাপের বাড়ি এসে হাজির। বলে গিয়ে মাসি পিসিরই ভাল কা চলে না, নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না তার ঠিক নেই, তার উপর আহ্লাদীর ভার কিন্তু মাসিপিসি এতটুকু দমে না, আহ্লাদীকে সাদরে ঘরে আশ্রয় দে শুধু তাই নয়, দত্ত নিজের বিয়েকরা ইস্তিরিকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও তা স্বামীর ঘরে যেতে দেয় না। বলে কোনদিন নেশাখোর মাতালটা 'মেয়া'(একেবারে নিকেশ করে ফেলবে তার ঠিক কী, মেয়েকে আমরা ফেরত পাঠা না। এই নিয়ে দত্তর সঙ্গে মাসি-পিসির খিটিমিটি, মনোমালিন্য কিন্তু বড় শক্ত ধাত মাসি পিসির, কিছুতেই তাদের টলানো যায় ন তারা বেঁচে থাকতে আহ্লাদীকে তারা খুনে স্বামীর ঘর করতে কিছুতে পাঠাবে না এই তাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ। সর্বদা আহ্লাদীকে চোখে চোখে আগ রাখে—বাজারে কেনাবেচা করতে যাবার সময়ও আহ্লাদীকে সঙ্গে করে সালতি বয়ে নিয়ে যায়। ছোট এক চিলতে সালতি তার দুই ধারে দুই প্রৌঢ়া, একজন হাতে লগি, একজনের বৈঠা। আর শুধু কি খুনে সোয়ামীর হাত থেকে 'মেয়া'কে বাঁচানো প্রয়োজন, গাঁয়ের কামার্ত বদমাইশগুলির লোভানি থেকে কি তাকে বাঁচানো সমান জরুরী নয়? এই দুই দায়িত্বই মাসি-পিসি সম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

গল্পের শেষে আছে গাঁয়ের কামলোলুপ পশুগুলির কবল থেকে আহ্লাদী বাঁচানোর তাড়নায় মাসি ও পিসির প্রতিরোধের আয়োজন কত সংকল্পদৃঢ় সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে তার একটি নিখুঁত ছবি। দুটি অশিক্ষিত গ্রাম্য নার মনের জোরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত চরিত্রবল যেন গল্পটির ভিতরে কথা ব উঠেছে। পাঠক মর্মের উপর এ গল্পের প্রভাবের কোন তুলনা নেই।

হারানের নাতজামাই মানিকের শেষ পর্বের আর একটি উৎকৃষ্ট গল এ গল্পটি বহুল পঠিত, উপরন্তু অভিনয়ের দৌলতে ব্যাপকভাবে পরিচি সুতরাং গল্পের কাঠামোটি এখানে বিস্তার করে তুলে ধরবার আবশ্যকতা নে তবে ময়নার মার চরিত্রটি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ এক আশ চরিত্র। এর কোন জুড়ি নেই বাংলা সাহিত্যে। যে পুলিশের চোখে ধূ

দেবার জন্য আত্মগোপনকারী কৃষক নেতাকে নিজের জামাই বলে চালায় ও মেয়েকে ঘরের ভিতর ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় তার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সংস্কার জয়ের বলিষ্ঠতা তুলনারহিত। সবকিছুর উপরে তার চরিত্রে জ্বলজ্বল করছে তার দুর্মর শ্রেণী চেতনা, যা শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আমোঘভাবে প্রযুক্ত। গ্রামের সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধতা ও একপ্রাণতা এই গল্পের আর একটি মূল্যবান আয়তন। এর একটি শিক্ষণীয় দিকও আছে। পড়ে-পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে সকলে মিলে একত্রে রুখে দাঁড়ালে যে কাজ হয় অনেক বেশী তার ইঙ্গিতে গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ।

পেটব্যথা গল্পের মধ্যেও সংঘবদ্ধতার একই রূপ জয় দেখতে পাওয়া যায়।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় বড় কমলাপুর অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনেব সময়কার পুলিশী সন্ত্রাসের চিত্র। পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধের তীব্রতার ভাবটিও গল্পটির ভিতর অব্যক্ত থাকেনি।

আর না কান্না গল্পটি লক্ষণীয় এই কারণে যে, ভাতের কষ্ট দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জীবনে যে কত দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে এই রচনাটিতে তার একটি মর্মান্তিক আদল পাওয়া যায়। আপাতবিচারে দেখলে মনে হতে পারে গল্পের বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ স্থূল কিন্তু এই স্থূলতা বহিরাবরণ মাত্র, তার পৃষ্ঠ ভেদ করে গোটা দরিদ্র সমাজের কান্না যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে একটা মর্মভেদী শূন্যতার হাহাকারে। ভাতের কষ্ট ভাতেরই কষ্ট মাত্র নয়, ধুঁকে ধুঁকে জীবন্মৃতবৎ বেঁচে থাকারও কষ্ট। গভীর কারুণ্যের বেদনায় গল্পটি পরিপূর্ণ।

———

বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাস : সমালোচকের সমস্যা

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রুচি-পছন্দ, দাবি-দাওয়া অনুযায়ী বইয়ের মূল্য বিচার করতে বসেন তিনি পাঠক হলে, নিজেকে ঠকান, আর সমালোচক হলে, পাঠককে ঠকান। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ স্বয়ং যদিও একজন সুপ্রতিষ্ঠিতা লেখিকা ছিলেন কিন্তু তিনি এখানে সাহিত্য বিচারের যে আদর্শ তুলে ধরেছেন তা একজন কলাকৈবল্যবাদী শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত।

কলাকৈবল্যবাদীরা শিল্প-সাহিত্যের বিচারণায় শিল্পকে কেবলমাত্র শিল্পের নিরিখেই মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট হন, একটা কল্পিত নান্দনিক উৎকর্ষের মান খাড়া করে তার ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন ক্রিয়ায় অগ্রসর হন। কিন্তু নান্দনিক উৎকর্ষের বস্তু নিরপেক্ষ কল্পিত মান বলে কিছু আছে? সব উৎকর্ষই কি শেষ পর্যন্ত পাঠকের নিজের ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগার রঙে রঞ্জিত নয়? অর্থাৎ পাঠকের নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-পছন্দ, ধ্যান-ধারণা, আশা-প্রত্যাশা দাবী-দাওয়া সব কিছু মিলিয়েই কি তিনি তাঁর পঠিত বইটির উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করেন না? তবে কেন সাহিত্য বিচারে যখন তখন এই নিরপেক্ষতার ধুয়া তোলা? কলাকৈবল্যবাদীদের নিজেদের ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ-চাহিদা-অচাহিদা ছিল না? অস্কার ওয়াইল্ড, যিনি ওই ক্ষতিকর তত্ত্বটির উদ্গাতা, তিনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারতেন তিনি যখন কোন বইয়ের ভাল-মন্দের বিচারে প্রবৃত্ত হতেন, তাঁর স্বীয় মানসিক গঠন, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, জীবন ও জগৎকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এসবের সম্মিলিত প্রভাব তাঁর বিচার ক্রিয়ার ভিতর প্রতিফলিত হতো না? ভার্জিনিয়া উল্‌ফের নিজের কোন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের জগৎ ছিল না? সব সময়েই তিনি তাঁর নিজের একান্ত মনোগত প্রত্যাশাকে একপাশে সরিয়ে রেখে সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক বিচার করতেন? করতে পারতেন? সমাজের বস্তুগত স্থিতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত যে-সৌন্দর্যের অস্তিত্বই নেই, সাহিত্যের ভিতর সেই মনগড়া সৌন্দর্য আবিষ্কার করে তিনি আত্মহারা হতেন?

সুতরাং কেন এই আত্মপ্রবঞ্চনা? কেন ওই কলাকৈবল্যের অলীক আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন? আমাদের সাহিত্যের অনুষঙ্গেই বিষয়টির আলোচনা করা যাক। কোন পাঠক যখন রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ে মুগ্ধ হন, সেই মুগ্ধতার মধ্যে কি তাঁর

ব্যক্তিগত মানসিক গঠনের একটা সুনিশ্চিত ভূমিকা থাকে না ? রবীন্দ্র কাব্য পাঠে তাঁর অপার আনন্দ কি তাঁর নিজের কাব্যামোদী স্বভাবটিকে চিহ্নিত করে না ? কোন সমালোচক যখন শরৎ সাহিত্য পড়ে তার ভিতর সমাজচেতনার দ্যোতনা আবিষ্কার করে পুলকিত হন, তখন এটা অনুমান করা কি অসঙ্গত যে, তাঁর নিজের সমাজচেতনার প্রতি পক্ষপাতটাই কিছুপরিমাণে শরৎ সাহিত্যের উপর গিয়ে প্রক্ষিপ্ত হয় ? এটা অস্বাভাবিকও নয় অন্যায়ও নয়, বরং এইটেই প্রত্যাশিত। কেননা তিনি যদি তাঁর নিজের সমাজচেতনার ঝোঁককে চেপে রেখে শরৎ সাহিত্যকে কেবল মাত্র গতানুগতিক শিল্পবিচারের মাপকাঠিতে খতিয়ে দেখতে অগ্রসর হতেন তো তিনি শরৎ-সাহিত্যের প্রতিও সুবিচার করতেন না, নিজের প্রতিও সুবিচার করতেন না। শরৎ সাহিত্যে সমাজ-চেতনার প্রকাশ একাধিকস্থলে আছে. সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা আছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের প্রতিবাদ আছে, আছে সামাজিক অবদমনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিক্ষোভ। কলা·কৈবল্যবাদী সাহিত্য বিচারের আদর্শের প্রতি ভক্তিবশতঃ সে সমস্ত সমাজ চৈতন্যের লক্ষণ দেখেও দেখব না, দেখলেও সেগুলির সম্বন্ধে নীরব থাকবো—সমালোচকের উপরে এ অনুচিত জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। শরৎ-রচনাবলীর ভিতর কেবল মাত্র সনাতন বাঙালী সংসারের পারিবারিক স্নেহ-বাৎসল্যের লীলা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তার বেশী কিছু তার মধ্যে প্রত্যাশা করতে গেলেই সেটা অনুচিত প্রত্যাশা হবে—এমন হাত-পা বেঁধে পাঠক বা সমালোচককে গতানুগতি সাহিত্যিক রুচির প্রতি কুর্নিশ জানাতে বলা তার উপর এক অসম্ভব জবরদস্তি। আসলে পাঠক বা সমালোচক যাই বলুন, তার মন বলে একটা কথা আছে। এমন যদি হয় যে তার মন নানা ভাবনা-চিন্তার ঘাত-সংঘাতে, রাষ্ট্র সমাজ ও সংসারের বিবিধ অভিজ্ঞতার প্রসাদে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে অথচ তার স্বদেশের সাহিত্য পেছিয়ে রয়েছে সে স্থলে কী কর্তব্য? সেই অগ্রসর পাঠক (অথবা সমালোচক) কি আপনকার মানসিক অগ্রগতির লয়কে খর্ব পঙ্গু করে প্রচলিত সাহিত্যের চলার লয়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হবেন ? সেটা করা কি তাঁর পক্ষে উচিত হবে ? তেমন স্থলে তিনি কি নিজের প্রতি ঘোরতর অবিচার করবেন না ?

এ সব প্রশ্ন আজকের দিনে খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে, কেননা দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে এমন একাধিক পাঠক আছেন যাঁদের মন ও মনন অত্যন্ত পরিণত অথচ সেই তুলনায় প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের মান খুবই পেছিয়ে আছে

সংশ্লিষ্ট পাঠকদের পরিণত মন ও মনন সমাজের বস্তুগত পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তনের পরিচায়ক, কারণ সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর না হলে তাঁদের মনের এমনতর পরিবর্তন কোনমতেই সম্ভব হতে পারতো না। ব্যক্তিমন তো একটা বিমূর্ত বস্তু নয়, নয় একটা সর্বাংশে স্বাধীন সত্তা, সমাজের প্রত্যেকটি এগিয়ে চলা-পেছিয়ে যাওয়া ছন্দের টানা পোড়েনের ছাপ ওই মনের উপর স্বতঃই গিয়ে পড়তে বাধ্য। সমাজ ও ব্যক্তি মন একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রূপে সম্পৃক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজে বসবাসকারী কিছু কিছু মানুষের মনের বৈপ্লবিক পরিণতি সাধিত হয়ে গেছে মেনে নিলে বুঝতে হবে যে সমাজে ওই সব মানুষের অধিষ্ঠান সেই সমাজেরও বাস্তব স্থিতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছে। অথচ এ বড় আশ্চর্য, সাহিত্য আগের জায়গাতেই স্থিতিশীল হয়ে আছে।

তার মানে সাহিত্য ক্ষেত্রে কালবারণ দোষ ঘটেছে। অর্থাৎ যুগ এগিয়ে আছে, সাহিত্য তার সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছে না, পিছিয়ে পড়ছে। তা থেকেই পাঠক সমালোচক একদিকে, অন্যদিকে লেখক ও প্রকাশক—এই দুই দলের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা, পাঠক আর সমালোচকের মধ্যেও অনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গীর অসমতা দেখা যাচ্ছে। অনুন্নত রুচির পাঠক যাদের সংখ্যা এখনও অগণন, আর অগ্রসর ভাবনা-ধারণা বিশিষ্ট সমালোচক—এই দুই ধরনের মানুষের ভিতর কোনমতেই মনের মিল হতে পারছে না এইটেকেই আমি 'কালবারণ দোষ' কিংবা সংক্ষেপে 'কালদোষ' বলে অভিহিত করতে চেয়েছি।

এসব কথা এখানে উত্থাপন করার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। অকারণে পূর্ব দুই অনুচ্ছেদের শুষ্ক তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করা হয়নি। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, এইটে বোঝানোর চেষ্টা করা যে, বাংলা কথাসাহিত্য সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বর্তমান রুচির বা উৎকর্ষের যে-পর্যায়ে রয়েছে, তার সম্বন্ধে উৎসাহিত বোধ করা কোন কোন সমালোচকের পক্ষে একেবারেই কঠিন। অবশ্য উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই রয়েছে কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্তগুলি পূর্বোক্ত সমালোচক বর্গের অভিনিবেশ প্রবলভাবে আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র নিজেদের শক্তির দ্বারা তাঁদের অন্তরের চাহিদাকে পুরাপুরি নিঃশেষ করতে পারছে না, এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য। কেবলমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর ধারাবাহী সমাজ-বাস্তবতার উত্তরসাধক সামান্য সংখ্যক তরুণতর গল্পোপন্যাসরচয়িতার দ্বারা সমালোচকের মনের বিরাট শূন্যতার অতৃপ্তিকে পূর

করা কি সম্ভব, না, উচিত ? আরও কেন বেশী বেশী সংখ্যায় সমাজসচেতন শক্তিমান নবীন কথাসাহিত্যিক বেরিয়ে আসছেন না, এই এক অনিবার্য প্রশ্ন সমালোচকের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বারে বারে। যে-সমালোচকের ত্রিকোণ প্রেমের গল্প কিংবা এই জাতীয় অসার মন-দেওয়া-নেওয়া খেলার বৃত্তান্ত সম্বলিত উপন্যাস পড়তে পড়তে অরুচি ধরে গেছে তিনি কেন ত'ার রুচির উপযোগী খাদ্য পাবেন না বাংলা গল্পোপন্যাস লেখকদের কাছ থেকে ?

আর সত্যি কথা বলতে, নালিশটা যতনা সমাজসচেতন লেখকের সংখ্যাল্পতার কারণে তার চাইতে অনেক গুণ বেশী প্রচলিত ধারার লেখকদের গতানুগতিক রীতির প্রতি অন্ধ আসক্তির দরুন। এখনও কেন শেষোক্ত শ্রেণীর কথাকারেরা তাঁদের পুরাতনের জাবর কাটার অভ্যাস ছাড়ছেন না ? এখনও কেন তাঁদের বেশীরভাগ রচনার কাহিনীর জগৎ পুরাতন পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ? পুরাতন পৃথিবীর ধ্যান-ধারণা, পুরাতন পৃথিবীর অভ্যাস ও বিশ্বাস, বিগত কালীন রীতিনীতি আচার-প্রথা লোকব্যবহারের সংস্কার, অতীত মূল্যবোধ ও সনাতন সামাজিক অনুশাসন এগুলি এখনও কেন আমাদের অধিকাংশ প্রবীণ ও মধ্যবয়সী কথাকারদের লেখনী অধিকার করে আছে ? যে মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলির আঘাতে সংঘাতে ক্রমক্ষীয়মাণ হতে হতে বিলুপ্তির কিনারায় এসে ঠেকেছে, যার টি'কে থাকার মত আর কোন অবলম্বনই নেই বলতে গেলে, তার জয়ধ্বনিতে বাংলা কথাসাহিত্যের আকাশ আর কতকাল তাঁরা ভরে রাখবেন ? কেন তাঁরা নতুন নতুন বিষয়বস্তুর দিকে এখনও চোখ ফেরাবেন না ? কেন শহরের শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ ও বঞ্চনার ছবি ত'াদের লেখায় আরও বেশী করে ফুটবে না ? যে গ্রাম শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মনোজ প্রমুখ পল্লীপ্রেমী শক্তিশালী লেখকেরা তাঁদের গল্পোপন্যাসে চিত্রিত করেছেন সে গ্রাম কি এখনও আছে ? তবে কেন একই ধারার গ্রামচিত্রকে অবলম্বন করে আমাদের পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশেরই 'নস্ট্যালজিক' ভাবাকুলতার আর নিবৃত্তি হতেই চায় না ? গ্রামের দরিদ্র চাষী ও ভূমিহীন মজুরের জীবন বেদনার ছবি কেন ত'াদের লেখায় ভুলেও একবার উ'কি দিয়ে যায় না ?

আমি বারেবারেই প্রশ্ন করছি, বলতে গেলে আমার আলোচনার মধ্যে পরের পর এক প্রশ্নের মালা গে'থে তুলেছি। এ আর কোন কারণে নয়,

গভীর অভাববোধ থেকে এ সব প্রশ্নের জন্ম। ন্যায়শাস্ত্রের 'বেগিং দ্য কোয়েশ্চন'-এর মত এই সকল প্রশ্নের উত্তর ওই সকল প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত আছে। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতিবাচক উত্তরে প্রশ্নের পরিসমাপ্তি। 'নেই, নেই, নেই' 'না, না, না,' 'নয়, নয়, নয়'—এই হলো আজকের বাংলা কথা-সাহিত্যের সাধারণ পরিস্থিতি বর্ণনার পক্ষে কতকগুলি জুতসই অব্যয়।

তার অর্থ, প্রকাণ্ড এক শূন্যতা বিরাজ করছে বাংলা কথাসাহিত্যের এলাকায় আজকের দিনে। সমাজবাস্তবতার আদর্শের অনুগামী যুগচেতন যে সব লেখক কথাসাহিত্যের চর্চায় নিরত রয়েছেন তাঁদের রচনা সর্বথা-অভিনন্দনযোগ্য হলেও তাঁরা সংখ্যায় এত অল্প আর তাঁদের সঙ্ঘশক্তি এত কম যে তাঁরা তাঁদের একার চেষ্টায় বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের বিরাট ফাঁকটা ভরিয়ে তুলতে পারছেন না। এঁদের বাদ দিলে, আর যাঁরা এই ক্ষেত্রে অনুশীলনে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের একটা মোটা ভাগই গত পৃথিবীর প্রতিনিধি। তাঁরা এখনও পুরাতনের রোমন্থন করে চলেছেন তাঁদের লেখায়, যুগধর্মের কোন স্বাদই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় না। যুগ এগিয়ে চলেছে, তাঁরা পেছিয়ে পড়েছেন।

তাঁদের এই অক্ষমতার দুটি কারণ থাকতে পারে। এক, এ যাবৎ অনুষ্ঠিত অভ্যাসের যান্ত্রিক বশবর্তিতা ; দুই, নতুনকে গ্রহণ করার অসামর্থ্য। কোন কোন লেখকের বেলায় এই দুইই একসঙ্গে ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব। অভ্যাস বড় সাংঘাতিক জিনিস, মলেও মরতে চায় না। যে-লেখক সারাজীবন মধ্যবিত্ত মানসিকতার পুরাতন-পরিচিত রেখাচিহ্নের উপর দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে হাত পাকিয়েছেন, তাঁর পক্ষে পুরনো অভ্যাস ছেড়ে নতুন অভ্যাস গ্রহণ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। অন্ধ আসক্তির মত অভ্যাসের মোহ বার বারই তাঁকে পুরাতনের অভিমুখে আকৃষ্ট করে রাখবে। তেমন লেখক পুরনো ধরনের রোমান্টিক প্রেমের ধারণা মরে গেছে জেনেও অভ্যাসের দাসত্ব বশতঃ এখনও 'বয়-বীটস্ গার্ল' ধরনের ছেঁদো ভালবাসার গল্প লিখে পাঠকের মনোরঞ্জন করতে চাইবেন, কিংবা মধ্যবিত্ত জীবনাচরণের প্রতি আসক্তি বশতঃ তুচ্ছাতি-তুচ্ছ মধ্য বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর-গেরস্থালীর সাদামাঠা গল্প ফেঁদে একালীন পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করবেন। প্রেমের গল্প লিখতে বসলেই সেটা দেহজ প্রেমের গল্প হওয়া চাই, অসুস্থ নর্বিড জৈব ক্ষুধার চিত্রণ ব্যতিরেকে প্রেমের গল্প হয় না, এই ভ্রান্ত ধারণার আধিপত্য আর কতকাল বাংলা সাহিত্যে

চলবে? আমাদের কথাসাহিত্যিকেরা কি প্রেমের প্রচলিত ধারণার উদ্দেশে প্রশ্নহীন আনুগত্য জানিয়ে দাসখত লিখে দিয়েছেন যে, তাঁরা জৈব আকর্ষণের গল্প ছাড়া আর কোন ধরনের ভালবাসার গল্প লিখবেন না? সুস্থ, সুন্দর প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি সমবিশ্বাসের সূত্রে এক জোড়া তরুণ তরুণীর মধ্যে ভালবাসা জন্মাতে পারে, কিংবা জীবিকার কর্মক্ষেত্রে সমরুচি বা সমপ্রাণতা সূত্রে নরনারীর মধ্যে প্রেমের বিকাশ হতে পারে—এ কেন তাঁরা মানতে চাইবে না? কর্মভিত্তিক ভালবাসার উদাহরণ আজকের সমাজে খুঁজলে আখছার মিলবে, তবু পুরনো অভ্যাসের অনুরক্তি বশতঃ প্রেমচিত্রণের নামে কামায়নের চিত্র চাই-ই চাই। এ যদি বিচারহীন মূঢ় আচরণ না হয় তো মূঢ়তা আর কাকে বলে জানিনে।

২

সাহিত্য পাঠক বা সমালোচক যাই বলুন, কোন ব্যক্তির মন যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করলে তাঁর জীবনে কী ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত থেকে তার দুই একটি নজীর তুলে ধরবার চেষ্টা করবো। দয়া করে এটাকে কেউ আত্মশ্লাঘার মনোভাবের নিদর্শন বলে গ্রহণ করবেন না, কেননা এই অভিজ্ঞতা একই কালে আমার পক্ষে সুখেরও বটে দুঃখেরও বটে। সুখের এই জন্য যে, এই অভিজ্ঞতার প্রসাদে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আমার মধ্যে একালীন যুগচেতনার ছাপ পড়েছে; দুঃখের এই জন্য যে, মনের এই বিশেষ গড়ন ও বিশেষ ধারার পরিণতির কারণে অনেক প্রচলিত গল্পোপন্যাসই আমার কাছে আজ অপাঠ্য বলে মনে হয়। এমনকি অনেক তথাকথিত নামী-দামী লেখকের রচনাকেও আর পূর্বের উৎসাহ নিয়ে পড়তে পারিনে, পড়তে গেলে নিজের মনের ভিতর থেকে বাধা পাই। এই জাতীয় কোন কোন লেখককে নিতান্ত জোলো বলে মনে হয়।

এই অভিজ্ঞতা আরও দুঃখের এই জন্য যে, এর ফলে আমার গল্পোপন্যাস পাঠের জগৎ অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গেছে, আমার পছন্দসই লেখকের সংখ্যা শোচনীয় রূপে কমে গেছে। পছন্দ করতে গেলেই যুগধর্মসচেতন প্রগতিশীল নতুন লেখকদের উপরেই ফিরে ফিরে আমার পছন্দ ন্যস্ত করতে হয়; সুপ্রতিষ্ঠিত, খ্যাতিমান অথচ চিন্তায়-চেতনায় গতানুগতিক লেখকদের গল্পোপন্যাস আর প্রাণ খুলে

পড়তে পারিনে। এ এক ভাল জ্বালা হয়েছে। পড়তে চাই অথচ পড়তে পারিনে এই সমস্যার সমাধান কে বাতলে দেবে?

যাঁদের রচনার প্রতি আমি আমার পক্ষপাত ঘোষণা করেছি তাঁদের রচনা-শৈলী সব সময় যে আমাকে আকর্ষণ করে তা বলতে পারিনে কিন্তু তাঁদের বিষয়বস্তুর নবীনতা আমাকে টানে। এই সব নয়া প্রজন্মের লেখকদের অনুভবের জগৎ নতুন, অভিজ্ঞতার ধরন আলাদা ; সেইটে একটা মস্ত কারণ যা আমার ভিতরকার বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মেটায় এবং আমার প্রগতিশীল আদর্শপ্রীতিকে তৃপ্ত করে। গত প্রজন্মের একাধিক কথাকার আছেন যাঁদের রচনাশৈলী ও ভাষা এই প্রজন্মের কথাকারদের তুলনায় অনেক বেশী পরিণত ও শিল্পসিদ্ধ, কিন্তু হায়, তাঁদের বিষয়বস্তু প্রায়শঃ খুবই মামুলী। এতই মামুলী যে তাঁদের স্বীকৃত লিপিকৌশল সত্ত্বেও তাঁদের গল্প বা উপন্যাস আমাকে আদপে আকর্ষণ করে না। আঙ্গিকগত শিল্পোৎকর্ষের খাতিরে আমি বিষয়বস্তুর মহিমা বিসর্জন দিতে নারাজ।

ধরা যাক বনফুল। বনফুল একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর গল্পের আঙ্গিকগত নৈপুণ্য অসাধারণ, ভাষাও বেশ পরিণত ও সংহত। কিন্তু যে সব বিষয় নিয়ে তিনি তাঁর গল্পোপন্যাসের জগৎটি গড়ে তুলেছেন তা এতই পুরনো আর একালীন প্রগতিশীল ধ্যান ধারণা থেকে এতই বিচ্ছিন্ন যে, পড়ে আদৌ মন ভরে না। এ কালের পৃথিবীতে বাস করে আমি গত যুগের বাসী বিষয়বস্তুর গল্পকথা শুনতে প্রস্তুত নই। 'হাটে বাজারে' নামে বনফুলের একটি উপন্যাস আছে। এ বইটি রবীন্দ্র পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে এবং সিনেমাতেও চিত্রায়িত হয়েছে। এক হৃদয়বান ডাক্তারের কাহিনী। ডাক্তারটির মানবিক মহানুভবতার একাধিক উপাখ্যানে উপন্যাসটির কলেবর পূর্ণ। মানবিকতা, মহানুভবতা এ গুলি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় গুণ এবং যে উপন্যাসের মূল উপজীব্য একজন ব্যক্তির মানবিক মহানুভবতাকে তুলে ধরা, তা অবশ্যই কিঞ্চিৎ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমন যদি হয় যে লেখক দারিদ্র্যকে আমাদের সমাজের একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ধরে নিয়েই তার ভিত্তির উপর কোন এক ডাক্তারের মানবিকতার সৌধটি গড়ে তোলার জন্য চেষ্টিত হয়েছেন এরূপ বোঝা যায়, সেক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। বস্তুতঃ এ বইয়ে লেখকের সেই অবৈজ্ঞানিক মানসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি গরীব রুগীদের দুরবস্থাকে ডাক্তারের মানবিকতা চর্চার একটা সহজ উপায়-

রূপে দাঁড় করিয়েছেন এবং এ বাবদে ডাক্তারকে অশেষ বিবেকের তৃপ্তি পেতে দিয়েছেন। ডাক্তার 'চ্যারিটির' মনোভাব থেকে গরিব রুগীদের উপকার করেন এবং উপকার করে মানবিক সান্ত্বনা লাভ করেন ; কিন্তু কেন গরিবের গরিবানা, সমাজে দারিদ্র্য কেন ও কাদের দ্বারা সৃষ্ট হয় সে বিষয়ে তিলমাত্র প্রশ্ন বারেকের জন্য তাঁর মনে উদয় হয় না। হবেই বা কী করে ? কেন না তিনি তো সে ভাবে সমাজের স্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত নন, সমাজে গরিব আছে বলেই তিনি তাঁর দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করবার সুযোগ পাচ্ছেন এই মনোভাবের দ্বারাই যে তিনি মূলতঃ চালিত ? গরিব না থাকলে ডাক্তারের মহানুভবতা প্রদর্শনের সুযোগ মিলত কি ? ওই বাবদে তিনি আত্মপ্রসাদ পেতে পারতেন কি ?

আসলে এ ডাক্তারের অচেতনতার প্রমাণ নয়, যিনি ওই ডাক্তার চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অচৈতন্যের প্রমাণ। শুধু 'হাটে বাজারে'ই নয়, বনফুলের আরও অনেক রচনায় এই জাতীয় অবৈজ্ঞানিকতা ও বিগতকালীন মনোভঙ্গীর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। হাটে-বাজারে উপন্যাসের হৃদয়বত্তার কাহিনী নিতান্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে লেখা। হৃদয়বত্তার কাহিনী এমন হৃদয়শূন্য প্রণালীতে লিখতে আর কোন লেখকই বোধহয় এরূপ সফলকাম হননি। তারাশংকরও বিগত পৃথিবীর লেখক কিন্তু তাঁর রচনায় এমন যান্ত্রিকতা নেই। তাঁর রচনা মানবদরদে ভরপুর। মানবদরদকে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রদর্শনীয় পণ্যরূপে খাড়া করেননি। মানবপ্রীতি সেখানে চরিত্রের অপরিহার্য উপাদান রূপে এসেছে এবং স্রষ্টার নিজ স্বভাবের সহজাত সহানুভূতির দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে। বনফুলের মত তারাশংকরের মানবিকতা লোক-দেখানো নয়। এই দুই লেখকের ভিতর মূলগত পার্থক্য কোথায়, উপরের বিশ্লেষণেরমধ্যেই তার হদিস মিলবে।

কিন্তু তারাশংকরও কি পুরোপুরি আমাকে টানে ? তাঁর জমিদারতন্ত্রের স্বশ্রেণীসুলভ পক্ষপাত এক এক সময় রীতিমত ক্লান্তিকর ঠেকে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী ব্যবস্থার প্রতি তাঁর অনবরত চোখের জল ফেলা আদিখ্যেতা বলে মনে হয়। বনফুল কিংবা তাঁর বর্গের কথাকারদের তুলনায় তারাশংকর অনেক বেশী শিল্পসিদ্ধ লেখক তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তিনিও আজকের সংগ্রামী প্রতিবাদী বিদ্রোহী শিল্পচেতনার মানদণ্ডে আমাদের প্রত্যাশাকে শোচনীয় রূপেই অপূরিত রাখেন। যতই শিল্প নিপুণভাবে পরিবেশিত হোক, গত পৃথিবীর বার্তা জেনে আমার কী লাভ, একমাত্র ইতিহাসের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করার তাগিদ ছাড়া এবং সমালোচকের অবশ্যকরণীয় কৃত্যগুলির অন্যতম—

সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত থাকার গরজ ছাড়া ? যদি বলেন বিশুদ্ধ সাহিত্যরসের এক অফুরন্ত প্রস্রবণ তারাশঙ্করের সাহিত্য, তার উত্তরে বলবো তারাশঙ্কর তথাকথিত বিশুদ্ধ রসের কারবারী লেখক নন, তিনিও তাঁর সময়কার প্রবহমাণ মূল্যবোধের দ্বারা ধর্ষিত এবং স্বশ্রেণীর সামাজিক রুচি পছন্দ সংস্কার ও বিশ্বাস দ্বারা পুষ্ট এক শিল্পকুশল লেখক। তথাকথিত নান্দনিক মানদণ্ড কোনমতেই তাঁর লেখায় প্রয়োগ করা চলে না।

বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গে এলে দেখতে পাই, তিনি তারাশঙ্কর অপেক্ষা হয়ত ওই যাকে বলে বিশুদ্ধতর ভাবরসের লেখক কিন্তু তাঁর আত্যন্তিক প্রকৃতি প্রেম আমাকে কমবেশী বিমুখ করে। প্রকৃতিকে আমরা সকলেই কমবেশী ভাল-বাসি এবং প্রকৃতির নির্জনতায় যেতে পারলে শহরের স্নায়ুপীড়িত অন্তর স্বস্তি ও শান্তি লাভ করে সে-কথাও ঠিক, তাই বলে উপন্যাসের আধারে প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা ('আরণ্যক') কিংবা বনজঙ্গলের নানাবিধ গাছগাছড়ার অন্তহীন বিবরণ ('পথের পাঁচালি') উপন্যাসে উপন্যাসের সাধর্ম্যের বিরোধী একটি সংযোজন বলে সন্দেহ হয়। উপন্যাস সমাজ প্রবাহের দর্পণ এবং সে সমাজ প্রবাহের কেন্দ্রমূলে অধিষ্ঠিত রয়েছে মানুষ, প্রকৃতি কিংবা অন্য কোন বিষয় নয়। স্পষ্টতঃই প্রকৃতি মানুষের স্থান দখল করতে পারে না উপন্যাসে, দখল করলে সেটা জবরদখলের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। মানুষ এবং তার অন্তর ও বাহ্জীবন যে-শিল্পের মূল উপজীব্য সেই শিল্পে প্রকৃতিকে অনুপাত-অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া এক ধরনের সমাজ অচৈতন্যেরই নামান্তর। বস্তুত বিভূতিভূষণের রচনায় সমকালীন প্রশ্ন সমস্যা জিজ্ঞাসা ইত্যাদির কিছুরই কোন ছাপ নেই। কেবল আছে 'এলিমেণ্টাল' মনুষ্যপ্রীতি, দারিদ্র্য দুঃখের মর্মস্পর্শী বর্ণনা, আর আর সীমাহীন প্রকৃতি প্রেম। মানুষকে গৌণ ভূমিকায় নিক্ষেপ করে প্রকৃতিকে নিয়ে তাঁর এই বাড়াবাড়ি এক এক সময় [illegible] হাঁফ ধরিয়ে [illegible]। এত প্রকৃতি[illegible] হজম করা সত্যিই একটু শক্ত [illegible]।

[illegible] আমাকে [illegible] বলে গাল পাড়তে চাই-[illegible] নিসর্গের [illegible] মাধুর্য সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] উপন্যাস [illegible]চর্চার

জায়গা নয়, ওটি সমাজপ্রবাহ পর্যবেক্ষণের এবং তার ফলশ্রুতি লিপিবন্ধকরণের জায়গা। সমাজপ্রবাহের কেন্দ্রে আছে মানুষ ও তার ব্যক্তিসত্তা। যত মানুষ, তত ব্যক্তিসত্তা। উপন্যাস সেই মানুষেরই কাব্য, প্রকৃতির কাব্য নয়। প্রকৃতিকে নিয়ে উদ্বেল হবার ভিন্নতর ক্ষেত্র আছে।

আর প্রকৃতি কি কেবল গাছ গাছালি লতা-পাতারই বর্ণনা? ঘেটু ফুল, ভাট ফুল, কালকাসুন্দি, বাসক, নিম-নিসিন্দা, তেলাকুঁচা ইত্যাদি এবং ইত্যাকার শতবিধ পুষ্পপলব লতার অন্তহীন অনুপুঙ্খ বর্ণনা 'ন্যাচারেলিস্ট' লেখকের মনোযোগ কেড়ে নিতে পারে কিন্তু তা কেন একজন ঔপন্যাসিকের মনোযোগের বিষয় হবে? পথের পাঁচালীতে লতাপাতার বর্ণনায় এতই আতিশয্য যে এক এক সময় ভ্রম হয় উপন্যাসের আবরণে যেন কোবরেজির দোকান সাজিয়ে বসা হয়েছে। আর প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনাই যদি মুখ্য অভিপ্রায় হয় তো অরণ্যানীর সামগ্রিক সৌন্দর্যেই কেন লেখক স্থিতমনোযোগ হন না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি গাছ গাছালির বর্ণনা দিতে কেন তিনি বদ্ধপরিকর (এবং মুক্তকচ্ছ) হন? গাছ গুণে গুণে বন দেখতে গেলে যে বন দেখা হয় না এই প্রাকৃতিক মৌলিক তত্ত্বটিও কি তাঁর জানা নেই?

আর এ প্রসঙ্গ বাড়াব না। শুধু এই বলব যে, তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণের পাশে রেখে তৃতীয় আর এক বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ঔপন্যাসিক মানিকের রচনাবলী তুলনা করলেই প্রথমোক্ত দুই জনার সঙ্গে শেষোক্ত জনার শিল্পসৃষ্টির পার্থক্য অচিরেই ধরা পড়বে। মানিক মানবকেন্দ্রিক লেখক ও বাস্তববাদী লেখক। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট শিল্পী মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের সমাজ বাস্তবতার প্রকৃত তাৎপর্য এখনও সমালোচকদের চোখে পুরোপুরি ধরা পড়েনি, ধীরে ধীরে সেটা উন্মোচিত হবে। এর কারণ এই যে, অনেক লেখকের তুলনায় যেমন কিছু কিছু পাঠক সমালোচক চিন্তাধারার দিক দিয়ে এগিয়ে আছেন, তেমনি আবার কোন কোন লেখক তাঁর যুগের সবচেয়ে অগ্রসর মনের চিন্তা-চেতনা থেকেও এগিয়ে আছেন। বর্তমানে বাস করেও ভবিষ্যতে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, ভবিষ্যত সমাজের ছবি মনে রেখে তিনি বর্তমানের বিশ্লেষণ করেন।

তেমনি এক লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর যুগের [illegible] অগ্রবর্তী ছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যের সব চাইতে [illegible] কেননা যা তিনি বিশ্বাস করতেন তার জন্য মূল্য দিতে সতত প্রস্তুত [illegible]

এবং মূল্য দিয়েও ছিলেন। তাঁর শিল্পচেতনা ষোল-আনা বাস্তবে প্রোথিত এবং সমাজভাবনায় দীপ্ত ছিল। তাঁর মধ্যে ছিল না তারাশংকরের আধ্যাত্মিক প্রবণতা, বনফুলের চিত্তশূন্যতা ও প্রেমহীনতা, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রেমের আতিশয্য ও অবাস্তব অলৌকিক প্রীতি ('দেবযান' উপন্যাস দ্রষ্টব্য), প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষার পঙ্গুতা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষার কৃত্রিম আড়ম্বর, অন্নদাশংকরের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপটবিবর্জিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমার উদঘোষণ, বুদ্ধদেব বসুর আত্যন্তিক অহংমনস্কতা ও দুরারোগ্য রোমান্টিকতা, প্রবোধ সান্যালের চিন্তাশূন্য গল্প বানাবার নিপুণ অভ্যাস। মানিকের গল্প উপন্যাস একান্তভাবে ইহমুখী, মর্ত্যবন্ধ, মানুষের দুঃখবেদনার আর্তিতে পূর্ণ অথচ তাঁর রচনারীতি প্রশ্নসংকুল সমালোচনায় সমাকীর্ণ, প্রতিবাদে উন্মুখর। তিনি শরৎচন্দ্রের মত সমাজ সমস্যা উপস্থিত করেই ক্ষান্ত হন না, ওই সমাজ সমস্যার কোন পথে সমাধান হতে পারে, কী উপায়ে সমাধান হতে পারে, তারও একটা হদিশ বাতলে দেন। সংগ্রাম সেই হদিশের নাম আর তার মুখ্য হাতিয়ার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। অন্যায় ও শোষণের মুখে পড়ে পড়ে মার খেলে কোন দুঃখেরই অবসান হওয়ার আশা নেই, রুখে দাঁড়াতে পারলে তবেই অত্যাচার হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করবে তার আগে নয়—গল্পে উপন্যাসে এই প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তিনি উদ্‌গাতা। অথচ তাঁর লেখায় শিল্প সৌন্দর্য ও দার্শনিক রসের কোন কমতি নেই। চিন্তাশীলতা মানিক-রচনার এক সহজাত সম্পদ।

সার্থক শিল্পী ও সার্থক কর্মী এক অবয়বে বিরাজমান এরকম লেখক বাংলা কথাসাহিত্যে এক জনাই মাত্র আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁর নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সমালোচকের সমস্যা নয় বরং সমালোচকই তাঁর কাছে সমস্যা তাঁকে যথার্থ অনুধাবন করবার মত সমালোচকের এখনও বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব হয়নি। ভবিষ্যতের সমালোচক এই দায়িত্বটি পালন করবেন বলে আশা করা যায়।

———

ছোটগল্প : বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন

ছোটগল্পের প্রসঙ্গে সমালোচকেরা প্রায়শঃ আপ্তবাক্যের ধরনে এরূপ বলে থাকেন যে ছোটগল্পের ভিতর বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন হয়। অথবা, সিন্ধুকে বিন্দুতে রূপায়িত করারই আরেক নাম হলো ছোটগল্প।

কথাটার মানে কী? ছোটগল্পের অনুষঙ্গে বিন্দু ও সিন্ধু কথা দুটি ঠিক কী জাতীয় তাৎপর্য বহন করছে? প্রশ্নটি নিয়ে এই প্রসঙ্গে কিছু-কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করা যেতে পারে।

ছোটগল্পের আয়তন বড় বা ছোট বা মাঝারি যাই হোক তার একটা কেন্দ্রীয় বিষয় থাকে, যেটিকে বিন্দু নামে অভিহিত করা যায়। এই বিন্দু হলো একটি মর্ম, একটি সার সংক্ষেপ, একটি সূত্রাকার সংকেত। একটি বিশেষ বক্তব্য, খুবই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, এই সারমর্মের মধ্য দিয়ে আভাসিত করে তোলাই ছোটগল্পকারের কাজ; কাজটির প্রকৃতি কবিতার মত। কবি যেমন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে যতই সংক্ষেপে বা স্বল্পায়তনে হোক মানবজীবনের এক সারসত্যকে উদ্ঘাটিত করেন, তেমনি ছোটগল্পকারও ছোটগল্পের শিল্পপ্রকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ বা মানুষের সমাজের বিষয়ে একটি বিশিষ্ট অনুভবকে সূত্রাকারে পাঠক-সমক্ষে তুলে ধরেন। এটি কবির কৃত্য, কথাকারের কৃত্য নয়, সেইজন্যই দেখতে পাই, ছোটগল্পকারকে প্রায়শঃ কবির সঙ্গে তুলনা করা হয়। প্রতি-তুলনাটিকে অযৌক্তিক বলতে পারিনে।

ছোটগল্পের প্রসঙ্গে বিন্দু কথাটার এখানেই-যাথার্থ্য।

অন্যপক্ষে ছোটগল্পের পরিবেশিত এই সারমর্মের মধ্যেই থাকে বৃহত্তর সমাজ ও সংসারের গভীর কোন সত্যের ব্যঞ্জনা। আমরা যেন ওই সারমর্মের মধ্যেই চকিতে সুবিশাল মানবজীবনপ্রবাহের একটা ক্ষণিক হলেও স্পষ্ট আভাস খুঁজে পাই। এটাকেই বলা যেতে পারে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর রূপায়ণ (শিল্পীর দিক থেকে), বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দর্শন (পাঠকের দিক থেকে)। গোষ্পদে যেমন গোটা আকাশের আভাস, শঙ্খধ্বনিতে সমুদ্র গর্জনের কল্লোল, তেমনি বিন্দুর মধ্যে এই সিন্ধুর আভাসন।

বলা বাহুল্য, এই বিন্দুতে সিন্ধুর রূপায়ণ কথাকারের কাজের এলাকায়

পড়ে। কথাসাহিত্যের মধ্যেও আবার যেটি বিশেষভাবে ছোটগল্প সাহিত্যরূপে চিহ্নিত, সেই সাহিত্যের পরিধিভুক্ত এই কাজ। উপন্যাস বৃহৎ শিল্পকর্ম, ছোটগল্প তার ঘনীভূত রূপ। উপন্যাস মানবসমাজ প্রবাহের পর্যবেক্ষণমূলক শিল্প, ছোটগল্পের প্রকরণের ভিতর স্পষ্টতঃই এই শিল্পের সূক্ষ্মতর প্রভাবের ছাপ চোখে পড়ে।

তাহলে কথাটা দাঁড়ালো এই যে, ছোটগল্পকার একই সঙ্গে কবি ও ঔপন্যাসিক। বিন্দু আকারে কবি, সিন্ধু আকারে ঔপন্যাসিক। কিংবা কথাটাকে ঘুরিয়ে এইভাবে বলা চলে যে, ছোটগল্পকার যতক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থান করেন ততক্ষণ তিনি কবি; যখন তিনি পরিসীমায় বিচরণ করেন তখন তিনি ঔপন্যাসিক। অর্থাৎ কবি ঔপন্যাসিকের মিলিত রূপেরই আরেক নাম হলো ছোটগল্পকার। সূত্রাকারে তিনি কবি, বৃহদাকারে ঔপন্যাসিক। ছোটগল্পের শিল্পটাই এমন যার মধ্যে কবিতা ও উপন্যাসের কারুকর্ম একসঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে আছে। ছোটগল্প বলে আলাদা কোন শিল্পের বিভাগ নেই, কবিতা আর উপন্যাসের শিল্পকর্মের সম্মিলিত যৌগিক রূপেরই নামান্তর স্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে ছোটগল্পের শিল্পরূপকে।

আমাদের সাহিত্যের ও বিশ্ব সাহিত্যের কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটাকে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' একটি উৎকৃষ্ট গল্প, বহুলপঠিত গল্পও বটে। গল্পের শেষাংশে যেখানে খুনের দায়ে জেল-খাটা রহমৎ জেল থেকে বেরিয়ে এসে মিনিদের বাড়ীতে মিনির সঙ্গে দেখা করতে গেল সেদিন মিনির বিয়ে—দেখা হওয়ার অসুবিধা। ভগ্নমনোরথ হয়ে রহমৎ ফিরে যাচ্ছিল, শেষে কী মনে হওয়ায় ফিরে এসে মিনির বাবার হাতে মিনির জন্য আনা আঙুর-কিসমিস-বাদামের উপহারের বাক্সটি তুলে দিয়ে মস্ত ঢিলা জামার ভিতরে হাত চালিয়ে বুকের কাছ থেকে এক টুকরোময়লা কাগজ বার করল। সেই ময়লা কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ—সুদূর আফগানিস্থানের মরুপর্বতের এক অজ্ঞাত গ্রামে কাবুলিওয়ালার যে ছোট মেয়েটি বাস করে ভুষা কালিতে মাখানো একটুকু তার স্মরণচিহ্ন। "কন্যার স্মরণচিহ্ন বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধা সঞ্চার করিয়া রাখে।"

গল্পের এই অংশটিতে আছে কবিতার সুস্পষ্ট আস্বাদন—লিরিকের ব্যঞ্জনা, ব্যক্তি-হৃদয়ের নিগূঢ় অনুভবের প্রকাশ। কিন্তু এই বিন্দুর মধ্যেই পরক্ষণে সিন্ধুর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতার মধ্যে মানবীয় সমাজ প্রবাহের সন্দর্শন-জাত উপন্যাসের রস অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ব্যক্তির অনুভব এই অংশে সার্বজনীন অনুভবে পরিণত হয়েছে। অংশটি এইরূপ—"দেখিয়া আমার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তখন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্ত বংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বত গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।"

অর্থাৎ গল্পের এই অংশটিতে পিতৃহৃদয়ের সার্বভৌম বাৎসল্যের ছবিটি আঁকা হয়েছে বড়ই মর্মস্পর্শী তুলিকাপাতে। আমরা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শনে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হলাম। পৃথিবীর সর্বত্রই পিতৃস্নেহের প্রকৃতি এক, এই সত্যের উজ্জীবনে গল্পটি কথা-কাব্য থেকে কথা-ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

কিংবা রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটি গল্প 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'। কাহিনীর একেবারে উপসংহারের কিছু আগে দেখানো হয়েছে রামকানাই নিতান্ত অসুস্থ শরীরে ভগ্ন মনে আদালতে হাজির হয়েছেন এবং এক সম্পত্তিঘটিত মামলায় সাক্ষ্য দিতে উঠে সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছেন। পুত্র, জননী ও শ্যালক চক্রান্ত করে তাঁর জ্যেষ্ঠা বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার জন্য মিথ্যা মামলা খাড়া করেছিল। পিতা পুত্রকে সমর্থন করলে মামলাটি দাঁড়িয়ে যেত কিন্তু বৃদ্ধ সেদিক দিয়েই গেলেন না। মামলাধীন সম্পত্তিতে যে তাঁর বিধবা ভ্রাতৃজায়ার অধিকারটাই ন্যায্য সে কথা একটুও ভীত বা বিচলিত না হয়ে বলে গেলেন। এক সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধের নিরপেক্ষ দৃঢ়তার কাছে মিথ্যা পরাজিত হলো। মামলা ফেঁসে গেল। এর পর আর বেশীদিন রামকানাই জীবিত ছিলেন না, অচিরকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হলো।

গল্পটির এই যে ঘটনার ছক, এর ভিতর একটা অভাবনীয়ের চমক আছে, আছে অপ্রত্যাশিতের বিস্ময়। সাধারণতঃ পিতারা পুত্রের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করেন না, এই গল্পের পিতা করেছেন। আদালতে দাঁড়িয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিতে দ্বিধা করেননি। বিস্ময়ের আঘাতটা সেই কারণে। এটাকে বলা যেতে পারে কাহিনীর বিন্দু অংশ। এক বৃদ্ধের নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ সত্যবাদিতার

ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে ঘটনাটি অকল্পনীয়তার সৌন্দর্য লাভ করেছে।

তাহলে গল্পের সিন্ধু অংশ কোথায় ও কিসে? ঠিক পরের লাইনেই তার ইঙ্গিত আছে, যেখানে লোকান্তরিত রামকানাইয়ের কোন এক নিকটতমা আত্মীয়া (লেখক নাম উহ্য রেখে ও পাঠকের অনুমানের উপর ছেড়ে দিয়ে গল্পের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়েছেন) এই বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন যে, মানুষটি গেলেন গেলেন, আরও কয়েক দিন আগে গেলেন না কেন? এই আক্ষেপের নিহিতার্থ হলো, আগে যদি যেতেন তাহলে আর মামলাটি ফেঁসে যেত না, বিচারাধীন সম্পত্তিটি অনায়াসে কুক্ষিগত করা যেত।

এইখানে মনুষ্য সংসারের স্বার্থপরতার এক চূড়ান্ত রূপের প্রকাশ। স্বার্থের তাড়নায় পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা বা অচ্ছেদ্যতার ধারণা কতখানি চিড় খেতে পারে তার এক জ্বলজ্যান্ত অপ্রীতিকর নমুনা। বিবাহিতা ভারতীয় নারীর কাছে স্বামীই ধ্যান জ্ঞান পরম আশ্রয় এই সংস্কারের প্রবল আধিপত্য — বৈধব্য তার নিকট এক দুঃসহ অভিশাপের মত। যে নারী বৈধব্যের যন্ত্রণা স্বীকার করে নিয়েও স্বামীর মৃত্যু কামনা করতে পারে, বুঝতে হবে স্বার্থ তার হৃদয়কে পাষাণ করে তুলেছে, তার সহজাত নারীত্বের সংস্কারের ভরাডুবি ঘটিয়েছে। অথচ সংসারে এ জাতীয়া নারীর সংখ্যা যে একেবারেই অপ্রতুল তাও নয়। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে যে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন অনুরূপ ক্ষেত্রে নারী কর্তৃক স্বামীর মৃত্যুকামনা, অন্ততঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেহাৎ অসম্ভব নয়। এটা ভাবালুতার কথা নয়, বিচক্ষণ সংসারজ্ঞানের কথা। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের সমাপ্তিতে সেই কঠিন অপ্রিয় অস্বস্তিকর সংসার সত্যেরই এক টুকরো আমাদের উপহার দিয়েছেন সাহিত্যের শিল্পোৎকর্ষে মণ্ডিত করে। কাহিনীর এই শেষ পর্যায়ে এসে গল্পটি উপন্যাসের কোঠায় প্রবেশ করেছে — সংসার জীবনের একটি রূঢ় সত্যের বিবৃতিতে বিরল বলিষ্ঠ একটি ব্যক্তির আচরণগত মহান্ সত্য সচরাচর ঘটমান একটি বিমর্ষ সংকীর্ণ মানবিক সত্যের অভিমুখে বাঁক নিয়েছে, বিন্দু সিন্ধুর দিকে মোড় ফিরেছে।

কিংবা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' নামক প্রসিদ্ধ গল্প। মহেশের প্রতি গফুরের মমতা, নিজে না খেয়েও তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা, ওই বাবদে মেয়ের সঙ্গে ছলনা ও মিথ্যাচার—এ সবই এক অবোলা জীবের প্রতি এক সর্বহারা কৃষকের অপরিমেয় কারুণ্যের আকৃতির মহান্ নিদর্শন। ব্যক্তিক আচরণের এক অত্যুজ্জ্বল মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত। কিন্তু আখ্যানাংশের শেষ ভাগে যেখানে গফুর কন্যা

আমিনার হাত ধরে ভিটামাটি-চ্যুত অবস্থায় ফুলবেড়ের চটকলের অভিমুখে রওনা হয়েছে জীবিকান্বেষণের তাগিদে, যেখানে আর গল্পটি ব্যক্তিক স্তরে সীমাবদ্ধ রইলো না, হয়ে দাঁড়ালো এক অকাট্য অর্থনৈতিক সমাজ-সত্যের দলিলনামার নিশানা। নিঃস্বতা ও রিক্ততার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়ে ক্ষেতের চাষী যে আর ক্ষেতের চাষী থাকে না, মাথা গোঁজবার চিরকালীন ঠাঁই আর চাষের জমি থেকে উৎখাত হয়ে কারখানার মজুরের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়, সেই ঐতিহাসিক সার্বভৌম সত্যের দ্যোতনায় গল্পের এই শেষাংশ ব্যক্তিগত কাহিনীর কাঠামো ছাড়িয়ে ছাপিয়ে অর্থনৈতিক সমাজ বিজ্ঞানের দেউড়িতে পৌঁছে গেছে। কারখানার শ্রমিক আর কেউ নয়, গ্রামের চিরাভ্যস্ত অবলম্বন থেকে উৎপাটিত ছিন্নমূল কৃষকেরই এক নয়া নামান্তরণ মাত্র—এই তাৎপর্যপূর্ণ সারসত্যের ইঙ্গিতে মহেশ গল্পের পরিসমাপ্তি। ব্যক্তিগত আচরণের বিন্দু এইখানে এসে সমষ্টিগত সত্যের সিন্ধুর বিশালতা প্রাপ্ত হয়েছে।

কিংবা ধরা যাক শেখভের প্রসিদ্ধ গল্প 'বেট' বা 'বাজী'। গল্পটির শেষে এক অভাবিতপূর্ব বিস্ময়ের চমক রয়েছে। কয়েক বন্ধু খেলাচ্ছলে বাজী ধরেছিল, তাঁদের মধ্যে যে ব্যক্তি কারাগারের নির্জন কক্ষে বা লোকসঙ্গবিহীন নিভৃত কোন কুঠরীতে বছরের পর বছর একাকী যাপন করতে পারবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মোটা টাকা ইনাম পাবে। কঠিন এই বাজী, সুকঠোর এই পরীক্ষা। তা সত্ত্বেও বন্ধুদের মধ্যে একজন রাজী হলো। উপযুক্ত আহার্য পানীয় বইপত্র ইত্যাদি দিয়ে শিক্ষিত সেই যুবককে কারাগারের সেলের তুল্য নির্জন এক প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ করা হলো। বন্ধুরা মাঝে মাঝে যান, জানলার ফাঁক-ফোকর দিয়ে অন্তরিত বন্ধুর হাবভাব আচার-আচরণ ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করেন। স্বেচ্ছা-বন্দিত্বের প্রথম কয়েক বছর অবরুদ্ধ ব্যক্তি সেলের অভ্যন্তরে স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করেন, খান দান ঘুমোন, পড়াশুনো করেন, বাজনা বাজান, আরও কত কী করেন। ধীরে ধীরে তাঁর সচলতা ও সক্রিয়তার পরিমাণ কমে গেল, বন্ধুরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, বন্ধু আর এখন আহার্য বা পানীয় ছোঁন না। প্রায়শঃ বিড়বিড় করে কী বলেন, বইপত্র অস্পৃষ্ট বা অপঠিত থাকে, বাজনায় ধুলো জমেছে, মুখে তাঁর চাপচাপ দাড়ি ও চুলে জটা, ইত্যাদি। এইভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল এবং প্রতীক্ষিত মুক্তির দিন এগিয়ে এলো। মুক্তির দিন খুব ভোরে বন্ধুরা আনন্দিত চিত্তে তাঁদের দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যবঞ্চিত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাবার

জন্য নির্জন প্রকোষ্ঠের দরজায় সমবেত হয়েছেন। তাঁরা এক অকল্পনীয় দৃশ্য লক্ষ্য করলেন। দেখলেন অন্তরীণ বন্ধু ছাড়া পেয়েও তাঁদের সংস্রব এড়িয়ে দেয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে ধরবার চেষ্টা করেও তাঁর নাগাল পেলেন না।

এই গল্পের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হলো, অন্তরীণ বন্ধুর বাজী ধরা, বাজী ধরে নিভৃত সেলের নির্জনতায় আত্মসমর্পণ করা কিংবা লোকসঙ্গবিবর্জিত অবস্থায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দেওয়া—এ সব ঘটনা সচরাচর না ঘটলেও নিতান্ত অসম্ভবের সীমার বহির্ভূত কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু সত্যিকারের চমকে আমরা চমকিত হলাম যখন দেখলাম দীর্ঘকাল নির্জন বাসের পর ওই ব্যক্তি মুক্তি আসন্ন জেনেও মুক্তির হাতছানি উপেক্ষা করে এবং সেই সঙ্গে বাজীর মোটা টাকার লোভ প্রত্যাখ্যান করে লোকসঙ্গ এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন। উন্মাদবৎ এই আচরণ সত্যই কি গতানুগতিক উন্মাদের আচরণ? বোধহয় নয়। গল্পের মধ্য দিয়ে শেখভের বক্তব্য সম্ভবতঃ এই যে, দীর্ঘকাল মানুষের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে একাকী জীবন যাপনে বাধ্য হলে মনুষ্যসঙ্গ স্পৃহাটাই মরে যায়, এরূপ ব্যক্তি এক একাচারী বিষণ্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, তার ভিতর মজ্জাগত অসামাজিকতার প্রবৃত্তি জন্মায়। সে পাগল হয়ে যায়। অতএব লোকসঙ্গই হলো সুস্থতার রক্ষাকবচ, অসুস্থ মানসিকতার প্রতিষেধক, সমষ্টি চেতনার মধ্যেই রয়েছে মানুষের সত্যিকারের বাঁচবার উপায়।

এই সত্যের ব্যঞ্জনাতেই গল্পটির ভিতর সিন্ধুর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তিগত আচরণের বিন্দু এখানে সামাজিক সত্যের সিন্ধুর বিশাল বারিধিতে মিশে লয় পেয়ে গেছে।

এরূপ আরও একাধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু তার বোধকরি প্রয়োজন নেই। যে কটি দৃষ্টান্ত উৎকলন করা হলো তার মধ্যেই বিন্দু-সিন্ধুর তত্ত্বটি প্রতীতিযোগ্যভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে বলে মনে করি।

———

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যবোধ

সেদিন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য বষীয়াণ সমালোচক এক সভায় আক্ষেপ করে বলছিলেন যে, আমাদের সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের কালচেতনা বড় দুর্বল ঃ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যক্রমাগত শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে লালন ও পোষণ করবার মনোভাব আজকের লেখকদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। বিলাপের সুরে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ঃ তবে কি বৈষ্ণব তথা শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সঞ্চয়, যা আমরা উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছি, বৃথা যাবে? কিংবা সামগ্রিকভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নামক যে ঐশ্বর্যময় রিক্থ আমাদের পূর্বাচার্যগণ আমাদের হাতে গচ্ছিত রেখে গেছেন তা হেলায় হারিয়ে যাবে? সাহিত্যগত কালচেতনার শুরু যদি হয় মাত্র এক প্রজন্ম বা বড়জোর দুই প্রজন্ম আগে থেকে, তবে তো বড়ই মুশকিলের কথা!

প্রবীণ সমালোচকপ্রবরের এই খেদোক্তির মধ্যে প্রভূত সত্য বিদ্যমান। সমকালীন লেখকদের লেখা পড়ে এবং তাঁদের সকলের সঙ্গে না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে মিশে আমার নিজেরও অনেক সময় এমনতরো কথা মনে হয়েছে। এতকাল এই প্রসঙ্গটির বিষয়ে আমি মনে মনে যা ভেবেছি সুধী সমালোচকের খেদোক্তির মধ্যে তার জোরালো সমর্থন পেয়ে উল্লসিত বোধ করেছি। আমার উল্লাস আরও এ কারণে যে, যে প্রবীণ সমালোচকের কথা বলছি তিনি সর্বাংশে গুণবিচারী সমালোচক, পারতপক্ষে কারও দোষ দর্শন করেন না। এমন যে সাতিশয় গুণগ্রাহী আর প্রিয়ংবদ মানুষ, তাঁরই চোখে যখন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটি ধরা পড়েছে তখন সেটি যে একটি মূলগত ত্রুটি তাতে সন্দেহ নেই। অতএব কেনই না এই উপলক্ষ্যে কিছু আলোচনা সমালোচনা করবার চেষ্টা করি? হয়ত এই আলোচনার মধ্যে বিষয়বৈশিষ্ট্যের জন্য কতকটা অপ্রিয়ভাষণের ঝাঁজ প্রকাশ পাবে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ভরসা করি পাঠক আমার এই ভঙ্গিটিকে কিছুটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখবেন ও সহ্য করবেন। তাঁদের অনুমোদন পেলে তবেই শুধু আমি মন খুলে কথা কইতে পারি।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমরা যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র তার কিছুকাল

আগে বিগত হয়েছেন। কবিগুরুর সর্বাতিশায়ী সৃষ্টিশীল অমর প্রতিভা তদানীন্তনকালের বাঙালী সাহিত্যিকদের মানসিকতাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে রবীন্দ্রনাথের আগেও যে বাংলা সাহিত্য বলে একটা বস্তু ছিল তা তাঁদের মনোযোগ এড়িয়ে গিয়েছিল। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম-দৃষ্টান্তের কথা অবশ্য আলাদা, তাঁদের বাদ দিয়ে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলের প্রেরণার একমাত্র উৎসস্থল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী যে বাংলা সাহিত্য, যার ভিতর মাইকেল ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-হেম নবীন-বিহারীলাল, তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন চেতনা, উৎসাহ, অবহিতির প্রমাণ পাওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথ এমনভাবেই তিরিশের লেখককুলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ছিলেন যে ওই আবেশের ফাঁক বেয়ে লেখকদের মনোযোগ দূরে বিস্তৃত হবার অবকাশ পেত না। মধুসূদন বঙ্কিম হেম নবীন প্রমুখ সম্বন্ধেই যখন এই উৎসাহহীনতা তখন ইংরেজ অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথীদের সম্বন্ধে উৎসাহ কতদূর গড়াতে পারে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

লেখকদের মধ্যে যাঁরা কথাসাহিত্যের চর্চা করতেন তাঁদের উপর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব সবিশেষ বিদ্যমান ছিল. খতিয়ে দেখলে, শরৎচন্দ্রের প্রভাবই বেশি ছিল ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তেমনভাবে তাঁদের মনোহরণ করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। কবিদের অনুরাগ ভক্তি ও পূজাব্যাকুলতার জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এই ক্ষেত্রে অন্য কোন কবির প্রবেশাধিকারের প্রশ্নই ছিল না। বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্যের যাঁরা খবরাখবর রাখেন তাঁরা জানেন নব পর্যায় 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কিভাবে মণিলাল-চারুচন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রেমাঙ্কুর-হেমেন্দ্রকুমার-সৌরীন্দ্রমোহনের দল ঐকান্তিক রবীন্দ্র উপাসনার একটি চক্র রচনা করেছিলেন। অন্যদিকে, কালিদাস-কুমুদরঞ্জন-করুণানিধান-কিরণধন-যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ কবিরা—যাঁরা পরবর্তীকালে সকলেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন – তাঁরাও একান্তরূপেই রবীন্দ্রভাবের ভাবুক ছিলেন। এঁদের বেলায় রবীন্দ্রচেতনা এমন একটা সর্বগ্রাসী প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে তাঁদের মনোযোগ সব সময় ওই কেন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে, সামগ্রিক বাংলা সাহিত্য রূপ যে বৃত্তের কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের অধিষ্ঠান, সেই বৃত্তের পরিধিতে তা কখনও সম্প্রসারিত হয়নি। অবশ্য তিনজন কবির মধ্যে এই আবিষ্ট রবীন্দ্রমনস্কতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়—তাঁরা হলেন মোহিত-

লাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রমরূপেই গণনীয় এবং শেষ অবধি তাঁদেরও রবীন্দ্র-বিরোধিতা অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এসেছিল। এর পরে কল্লোলের লেখকেরা আর একবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু সে বিদ্রোহের মধ্যে প্রত্যয়ের কোন জোর ছিল না। তা নিতান্তই ভঙ্গিসর্বস্ব বিদ্রোহ ছিল।

মোদ্দা কথাটা তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে রবীন্দ্রচেতনা বাংলা সাহিত্যের আকাশে বাতাসে একটা সর্বব্যাপক ভাবপরিমণ্ডলের মত বিরাজমান ছিল। ক্ষুদ্র-বৃহৎ-মাঝারি কোন লেখকই ওই আবহের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি। এর ফল সবটাই যে ভাল হয়েছে তা বলা যায় না। এই অতিরিক্ত রবীন্দ্রমনস্কতার ফলে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুর্বল থেকে গেছে। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক আর বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের লেখকেরা যে রকম উৎসাহ অভিনিবেশের সঙ্গে মাইকেল-হেম-নবীন প্রমুখের কাব্য আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধরাজির আলোচনা করেছেন, উত্তরকালের লেখকদের তার সিকির সিকি অলোচনা করতেও দেখা যায় না। আর পুরাতনের বিষয়ে আগ্রহ আর অভিনিবেশ তো প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের খাতিরে চর্যাপদ, বৈষ্ণবকাব্য আর মঙ্গল-কাব্যের পঠনপাঠন আজও কিছু পরিমাণে অব্যাহত আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রভাব ছাত্র ছাত্রীদের জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সাহিত্যের বৃহত্তর জগতে তার ছাপ পড়েনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার রেওয়াজ আজকাল একপ্রকার উঠেই গেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকীয় পরিমণ্ডলের বাইরে একমাত্র ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখায় ছাড়া এ-বিষয়ক চেতনার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষার আদিমাতা সংস্কৃত সম্বন্ধে অনৌৎ-সুক্যের পরিচয় দিয়ে আমরা খুবই সাহিত্যপ্রীতি দেখাচ্ছি যা-হোক!

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব আমাদের কালেই দেখা দিয়েছিল, এখন তো তার ভরা পূর্ণ হয়েছে। অথচ এক সময়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যের উপর কত যে আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্র-

লাল রায় এঁদের সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা আজও রসবাদী সমালোচনা আর ঐতিহ্যপ্রীতির পরাকাষ্ঠারূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। এখন বাংলা ভাষায় এ জাতীয় আলোচনা হওয়া তো দূরের কথা, পুরাতন যেসব আলোচনা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধেও ঔৎসুক্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা আমাদের অতীত সাহিত্যকে বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত করে চমৎকার এক পশ্চাৎটানশূন্য নিরবলম্ব আধুনিকতার ভেলায় ভেসে চলেছি! হাল্কা হাওয়ার টানে এ ভেলা তরতর গতিতে বয়ে চলেছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক এ ভেলার বেগ খুব স্বচ্ছন্দ, কিন্তু পিছনে কোন ভার না থাকাতেই যে গতির এই আপাত-স্বচ্ছন্দ প্রবহমাণতা সেটা কারও চোখে পড়ছে না। যে নৌকোর ওজন নেই, বোঝা নেই, তা তো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জল কেটে চলবেই। কিন্তু এই ক্ষিপ্রতা যে অন্তঃসারশূন্যতার কারণেও হতে পারে সে খেয়াল কেউ করছেন না।

মানি কালের অগ্রগতির সঙ্গে পুরাতনের চেতনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। যুগ থেকে যুগান্তরের পথে যত আমরা এগোতে থাকি তত পুরাতন যুগের চেতনা ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। পরন্তু আধুনিক কাল নবীনদের মনোযোগের উপর তার দাবি পেশ করে। এককালে মধুসূদন-হেম-নবীন-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের চর্চাকারীদের মনোযোগের একেবারে কেন্দ্র মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরবর্তী সময়ে নিতান্ত বোধগম্য কারণেই তাঁরা নবাগত শক্তিমান কবি ও ঔপন্যাসিকদের পথ করে দিয়ে চিরায়ত লেখকদের সুসজ্জিত পার্শ্ব-কুঠরিতে স্থান করে নিতে বাধ্য হন। এখানে কে বড় কে ছোট, কে বেশি শক্তিমান কে কম শক্তিমান এই তারতম্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে না ; কারণ সাহিত্যের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সাহিত্য চলমান এবং জীবন্ত, সে সাহিত্য শাশ্বত মূল্যবিচারে যথেষ্ট স্থায়ী হোক আর নাই হোক, তার আকর্ষণ সব সময়েই চলতি কালের পাঠকদের কাছে বেশি। একদা ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল পাঠকের মনোযোগ দখল করে ছিলেন, তার পরে এলেন মধুসূদন-হেম নবীন, তার পর বিহারীলাল অক্ষয় বড়াল [illegible] যুগ, তার পর প্রদীপ্ত আলোকশিখার মত অত্যুজ্জ্বল [illegible] দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার পর মোহিতলাল [illegible] করুণানিধান যতীন্দ্র [illegible] আসর [illegible]। এর পরে এলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র [illegible] বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তীদের যুগ: এখন তাঁরাও

মনোযোগের আড়ালে পড়ে যেতে শুরু করেছেন এবং তাঁদের জায়গায় স্বভাবের নিয়মেই আত্মপ্রকাশ করেছেন আঙ্গিক ও ভাববস্তুতে আরও বেশি অভিনবত্ব-প্রয়াসী কবির দল। শুধু তাই নয়, এঁদের পাশাপাশি 'হাংরি' আর 'অ্যাংরি' দের দাপাদাপিও শুরু হয়েছে। তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে এক শ্রেণীর পাঠকের মাতামাতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কালের নিয়মেই এই সব ঘটছে।

এই পর্যন্ত যুক্তিক্রমটি বোঝা যায়, কিন্তু অভিনবত্বের চর্চার নামে, আধুনিকতার অভিমানবশতঃ, কেবলমাত্র চলতি কালেই যদি মনোযোগ সংলগ্ন থাকতে দেখা যায়, লেখকের মনোভঙ্গিতে ঐতিহ্যচেতনার বাষ্পও যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেই হয়। চলতি কালের লেখকদের সম্পর্কে উৎসাহের সজাগতা থাকা ভাল কিন্তু ঐতিহ্যের চেতনাকে বাদ দিয়ে কোনমতেই ওই সজাগতার অনুশীলন হওয়া উচিত নয়। ঐতিহ্যজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে তবেই শুধু আধুনিকতা সত্যিকার জোরালো হতে পারে। এমন বলব না যে অদ্যকার প্রগতিশীল মনোভঙ্গিকে বর্জন করে আমাদের পুরাতনের সুরে সুর মেলাতে হবে, যে মানসিকতায় একদা বাংলা সাহিত্য সংলগ্ন ছিল সেই উৎসে ফিরে যেতে হবে। তা কখনও কাম্য হতে পারে না। কিন্তু ঐতিহ্য সম্বন্ধে কোন চেতনাই নেই, শ্রদ্ধাবোধ নেই, অথচ মাতৃভাষার চর্চা করছি বলে অভিমান আছে ষোল-আনা, তার উপর অধিকন্তু হিসাবে আছে প্রগতির অহংকার—এ জাতীয় অভিমান আর অহংকারের কোন মানেই হতে পারে না। এ আত্মাভিমান অসার, পলকা, ভিত্তিবির্বাজত। এই আত্মক্ষয়কর মোহের যত শীঘ্র অবসান হয় ততই মঙ্গল।

২

আত্যন্তিক রবীন্দ্রমনস্কতার কিছু অপূর্ণতা থাকলেও যাঁরা এ-জাতীয় মানসিকতার অধীন ছিলেন তাঁদের সপক্ষে এই একটা দম্ভ বলবার কথা যে, তাঁরা যাঁকে আশ্রয় করেছিলেন তিনি এক পরম আশ্রয়, যুগ যুগ ধরে সে আশ্রয়ের তলায় মাথা গুঁজে থাকলেও নিরাপত্তাবোধে ফাটল ধরবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে এবং তাঁকে দিয়েই যাঁদের ঐতিহ্যচেতনার শুরু তাঁদের অতীত দৃষ্টি কিছু অস্বচ্ছ হলেও আর যাই হোক তাঁরা যে এক বৃহৎ বনস্পতির ছায়ায় আশ্রিত এবং সেই হিসাবে ভাগ্যবান সে কথা তো অস্বীকার করা যায় না।

না-ই বা রইল মধুসূদন বা বঙ্কিম সম্বন্ধে সুতীব্র মনোযোগ, বৈষ্ণব আর মঙ্গল কাব্যের যুগ সম্পর্কে না-ই বা থাকল সাভিনিবেশ উৎসাহ ; একা রবীন্দ্রনাথেই যে অনেক অপূর্ণতার পূরণ হয়ে যায়। আর তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তো বিচ্ছিন্ন আবির্ভাব নয়, তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে, অস্ফুটে অথবা স্ফুটতর-ভাবে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিগতকালীন সকল যুগের ছায়াই প্রলম্বিত হয়ে আছে। পুরাতন সব প্রভাবই রবীন্দ্রকাব্যে সমাহৃত ও জীর্ণ। গোটা বাংলা ভাষার ঐতিহ্য রবীন্দ্রভাষার ঐতিহ্যে একাঙ্গীভূত হয়ে গেছে এবং তাকেও ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন। ভাষা বলতে এখানে ভাষা, ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুর সমাহার বোঝাচ্ছে। তা যদি হয় তো রবীন্দ্রনাথকে যারা পরমাশ্রয়রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁরা প্রকারান্তরে গোটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্র-নাথকে ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করা মানে পরোক্ষভাবে এবং পরিস্রুত আকারে, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের নির্যাসকেই আপনার করে নেওয়া।

কিন্তু যাঁদের ঐতিহ্যচেতনার শুরু ধরা যাক জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে দিয়ে, তাঁদের সম্বন্ধে কী বলা যায়? এঁরা আধুনিকতার অভিমানে এবং কাব্যক্ষেত্রে নতুন কিছু একটা করার নেশায় এমনই ডগমগ যে, বাংলা সাহিত্যের উনিশ-শতকীয় অথবা তার চেয়েও দূরবর্তী, প্রাচীনতর ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার প্রয়োজন বোধ করা তো দূরস্থান, খোদ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও শ্রদ্ধান্বিত হওয়ার আবশ্যকতা এঁরা অনুভব করেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এঁদের বেলায় বাংলা সাহিত্যের মাইলচিহ্নের শুরুই হয় রবীন্দ্র-নাথের পরবর্তী কাল থেকে। মাত্র কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ নামক এক পরম বিস্ময় যে বাংলা সাহিত্যের দশদিক আচ্ছাদিত করে ছিল সেই আনন্দিত ও শ্রদ্ধিত চেতনার ক্ষীণতম প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া যায় না এঁদের হাবেভাবে, লেখায় ও আলোচনায়। এঁদের বেলায় কালচেতনার আদিবিন্দু জীবনানন্দ অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা অমিয় চক্রবর্তী—এর ওপারে ও আগে আর যা-কিছু আছে সব এঁদের চোখে ঝাপসা। এরকম ক্ষীণ ঐতিহ্যচেতনা নিয়ে আর যা-ই করা যাক সাহিত্যানুশীলন করা চলে না।

এমন কথা বলব না জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধেয় কবি। তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয় কবি এবং সেই হিসাবে কাব্যামোদী পাঠকমাত্রেরই মনোযোগের পাত্র। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, তাঁরা অসম্পূর্ণ কবি,

খণ্ডিত কবি—বাংলা কবিতার চিরাচরিত ভাষা তাঁদের কাব্যের ভাষায় প্রতিফলিত হয়নি, তাঁরা কম-বেশী বিদেশী diction-এ বাংলা কাব্য রচনা করেছেন। জীবনানন্দ রূপসী বাংলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সৌন্দর্য বিহ্বলতা আর মুগ্ধতাকে যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন সে ভাষার সঙ্গে বাংলা কাব্যের পরম্পরাগত ভাষাভঙ্গির প্রাণের যোগ নেই। তাঁর রূপকল্প, উপমা, শব্দ ব্যবহারের রীতি সবই আধুনিক বিদেশী কাব্যাদর্শে গঠিত। এ কাব্যের ধাঁচধরন অনুধাবন করলে মনে হয় না এ কাব্যের রচয়িতা আমাদের প্রাচীন কাব্য-ঐতিহ্যের সযত্ন অনুশীলন কখনও করেছেন। অনেকে সুধীন্দ্রনাথকে মাইকেলের স্বগোত্র কবি বলে মনে করেন। কিন্তু এ প্রতিতুলনা বহিরঙ্গ সাদৃশ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং অমান্য। মাইকেলসুলভ সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ সুধীন্দ্রনাথে আছে ঠিকই কিন্তু যে মন ও মেজাজ নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দসম্ভারের দ্বারস্থ হয়েছেন তার সঙ্গে এ দেশের জল-হাওয়ার কোন যোগ নেই। সে মন ইউরোপিয়ানার দ্বারা চোদ্দ-আনা চর্চিত। মাইকেল খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং হাবেভাবে সাহেব ছিলেন ঠিক কথা, কিন্তু তা বলে তিনি এ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে অন্তরের যোগ হারাননি। তিনি যে এ দেশের মহাকাব্য আর পুরাণ আর বৈষ্ণবকাব্যের ভাবরসে কতখানি নিস্নাত ছিলেন তার প্রমাণ তো তাঁর কাব্যের মধ্যেই রয়েছে, তার জন্য তাঁর জীবনচরিত সন্ধান করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তেমন কথা কি সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা যায়? তিনি তো মানসিকতায় আধা-সাহেব আধা-ভারতীয়, শুধু অনুগ্রহ করে বাংলা কাব্যচর্চার দিকে নজর দিয়েছিলেন এই মাত্র।

আমার এক এক সময় আরও ভয়ংকর কথা মনে হয়। সেটা ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব বুঝতে পারছিনে। জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ গোত্রের বিদেশী ভাবাপন্ন কবিরা শুধু যে বাংলা কাব্যের পরম্পরাগত ঐতিহ্য-সংস্কার সম্বন্ধেই চেতনাক্ষীণতার পরিচয় রেখেছেন তা-ই নয়, রবীন্দ্রকাব্যও তাঁরা ভাল করে অনুশীলন করেছেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। তা যদি করতেন তা হলে তাঁদের কাব্যভাষায়, ছন্দোভঙ্গীতে ও ইমেজ বা রূপকল্পের প্রয়োগে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পরিমাণে রবীন্দ্রকাব্যের আদল দেখা দিত, কিন্তু একান্তই এই ক্ষেত্রে প্রমাণাভাব। এঁদের ভাষার খোলসটাই শুধু বাংলার, ভিতরকার উপাদান সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে বিজাতীয় কাব্যের সূত্রে আহৃত।

এখন, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ বা ওই গোত্রের অন্য কোন কবি যেখানে সাহিত্যিক কালচেতনায় ক্রমবেণী ঐতিহ্য বিচ্যুত সেখানে কাব্যচর্চার ফসল কতটা সমৃদ্ধ হতে পারে তা সুধীজনকেই বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, নতুন কালের কবিরা জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী বা বিষ্ণু দে কে মাথায় করে রাখুন, তাতে দোষ দেখিনে— অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাময়িক রুচির চাহিদাকে মান্য না করে উপায় নেই, সমসাময়িকের প্রতি অনুপাত-অতিরিক্ত আকর্ষণ মানব-স্বভাবের এক অচ্ছেদ্য দুর্বলতা—কিন্তু দোহাই, তাঁদের উৎসাহ আর অভিনিবেশ যেন কেবলমাত্র ওই ক'টি কবিতেই নিঃশেষিত হয়ে না যায়, এঁদের অগ্রবর্তী হিসাবে পূর্ব পূর্ব যুগে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কেও যেন উৎসাহের কিছু ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট থাকে। একালের কাব্যচেতনার শুরুই যদি হয় রবীন্দ্রপরবর্তী কাল থেকে তবে তো বড় সাংঘাতিক কথা। ভাব সর্বদাই নূতনত্বের অপেক্ষা রাখে, সাহিত্যে নূতন নূতন চিন্তার ও কল্পনার দিগন্ত উন্মোচিত হবে এইটেই প্রত্যাশিত, এই ক্ষেত্রে ঐতিহ্যেরভূমিকা তেমন গুরুতর নয় বলেই আমার ধারণা—কিন্তু যে ভাষারীতি, প্রকাশশৈলীর সহায়ে সেই নূতন ভাববস্তুকে রূপ দেবার কথা, সেখানে ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করবার কোন উপায়ই নেই। প্রত্যেক সাহিত্যেরই ভাষার একটা চিরাগত স্বীকৃত রূপ আছে, তাকে ওই ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ড বলা হয়। ওই স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায় পদ্ধতি প্রকরণ রীতি ও রূপ বিধিমতে আয়ত্ত করবার জন্যই ঐতিহ্যচর্চার একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত উৎকেন্দ্রিক ভাষা দিয়ে কখনও পাঠকের চিত্ত জয় করা যায় না। ভাব যতই মৌলিক আর নূতন হোক, কল্পনা যতই অভিনবত্বপ্রয়াসী আর সৃষ্টিলক্ষণাক্রান্ত হোক তা যদি উৎকেন্দ্রিক আর বিজাতীয় ভাষাভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়, পাঠকমনের উপর তার প্রভাব কখনও গভীর রেখায় মুদ্রিত হতে পারে না।

কবিত্বের ক্ষেত্র ছেড়ে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই সেখানেও বিজাতীয়তার ছড়াছড়ি। বিদেশী কথাসাহিত্যের অপকৃষ্ট আদর্শের প্রতি এক শ্রেণীর লেখক গললগ্নীকৃতবাস, কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এঁদের আকর্ষণ করে না। স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর ধরে টানাটানির এ জাতীয় মনোভঙ্গীটাই লজ্জাকর। আগে দেশকে জানতে হবে তারপর বিদেশকে আগে জাতীয় সাহিত্যের ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, তারপর সময় থাকে

তো বিদেশী সাহিত্যের ধারাধরনের সংগে পরিচিত হও, না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এদের বেলায় প্রক্রিয়াটা উল্টো আকারে দেখা দেয়। এঁরা আগে বিদেশী সাহিত্যের ভক্ত, তারপর দেশীয় সাহিত্যের, তাও শেষোক্ত ক্ষেত্রে কতটা ভক্ত স্থিরনিশ্চয় করে বলবার যো নেই।

এই জাতীয় লেখকদের ঐতিহ্যচেতনা যে দুর্বল তার স্বপক্ষে আর একটি অনুমান উপস্থিত করছি। অনুমানটিকে নানা লক্ষণদৃষ্টে বোধ হয় প্রামাণ্য মনে করা যায়।

দেখা যায় এই শ্রেণীর লেখকই শ্লীল অশ্লীল বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ অশ্লীলতার সপক্ষে কথা বলেন এবং বিদেশী সাহিত্য থেকে নজীর উপস্থিত করেন। বাংলা সাহিত্য থেকেও কখনও কখনও, বোধ হয় শোনা কথার উপর নির্ভর করে, 'কৃষ্ণকীর্তন' আর 'বিদ্যাসুন্দরে'র নাম করেন। কিন্তু এঁদের খেয়াল নেই যে, পুরাতন যুগ আর সমকালীন যুগের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ নামক তিন বিরাট বনস্পতির আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁদের অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়া যথেষ্ট পরিমাণে নির্মল আর শোধিত হয়ে গেছে। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র তাঁদের নিজ নিজ কালের বাস্তব জীবনের ছবিই উপস্থিত করেছেন, তা বলে বাস্তবচর্চার নামে তাঁদের নোংরা ঘাঁটবার কখনও প্রয়োজন হয়নি, যে কাজ হালের কয়েকজন অন্যথা শক্তিমান বিভ্রান্ত লেখক হামেশাই করছেন। মানুষের সুপ্ত জৈব প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে পয়সা পেটবার মতলব ছাড়া ভিন্নতর বা উচ্চতর কোন মতলব এঁদের রচনার পিছনে আছে বলে তো মনে হয় না। এই বৈশ্যচর্চ্চা বেশ্যাচারেরই নামান্তর।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এঁদের বেলায়ও তাই। অপকর্মের পিছনে যুক্তি যোগাতে চতুর লোকের ঘটে বুদ্ধির অভাব হয়েছে এমন কখনও দেখা যায়নি। অশ্লীলতার সমর্থনে এঁরা প্রায়ই এই ধরতাই বুলি ঝাড়েন: সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীল বড় কথা নয়, রচনাটি সাহিত্য কি অসাহিত্য হয়েছে সেইটেই ধর্তব্য বিষয়। অহো, কি বিচক্ষণ সাহিত্যজ্ঞান! কি গভীর সহানুভূতি আর তীক্ষ্ন সৌন্দর্যবোধ! অভিজ্ঞতার কথা না-ই ধরলুম, যাঁদের বয়সটাই এখনও কাঁচা তাঁরা করবেন সাহিত্য অসাহিত্য বিচার? সাহিত্যের পাকা জহুরী

হতে হলে একটা গোটা জীবনের সাধনা প্রয়োজন—একনিষ্ঠ সারস্বতব্রতধারী ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারও অভিমত প্রকাশের এক্তিয়ার থাকতে পারে না। কিন্তু এ সব কথা কাকে বলব। আজকাল বালখিল্যদেরই যুগ—বালখিল্য ধ্যান-ধারণার মানদণ্ডেই সাহিত্যের পরিমাপ হচ্ছে। এ ধারণায় ঐতিহ্য অনুপস্থিত, পূর্বাচার্যরা অস্বীকৃত, জাতীয়তা ভূলুণ্ঠিত। সুতরাং ফল যা হবার তাই হচ্ছে। সুস্থ ঐতিহ্যচেতনার প্রতিষেধক ছাড়া সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উন্মার্গগামিতা রোধ করা শিবেরও অসাধ্য।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বর্তমান। প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো এই ঐতিহ্য। বহু বহু প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের রচনাবলীর দ্বারা এই ঐতিহ্যটি পুষ্ট হয়েছে। মনস্বী প্রবন্ধকারদের সে এক সারিবন্ধ মিছিল বলা যায়। এই মিছিলের পুরোভাগে বিদ্যমান কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক হলেন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়-কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের পরস্পরের রচনাধারার মধ্যে বিষয়বস্তুগত যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এই এক বিষয়ে তাঁদের গভীর মিল ছিল যে, তাঁরা সকলেই অসংশয় যুক্তিবাদের চর্চাকারী ছিলেন। যুক্তিবাদ বা র‍্যাশনালিটি তাঁদের রচনার মূল ভিত্তি ছিল, আর এই যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেই সন্দর্ভ, নিবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রবন্ধ, সমাজ প্রবন্ধ, ইতিহাস যিনি যাই লিখুন, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের বিস্তার করতেন। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যের 'এজ অব রীজন' এর খাত বেয়ে আসা যুক্তির সংস্কার তাঁদের প্রত্যেকেরই মানসিক গঠনের পিছনে কম বা বেশী পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার নজির আছে।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পথিকৃৎ এইসব দিক্‌পাল লেখকদের যুক্তিবাদ বঙ্কিমচন্দ্রে এসে পূর্ণতা পায়। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও অপরিসীম সৌন্দর্যপ্রাণ সৃষ্টি-কুশল লেখক ছিলেন—সমালোচকপ্রবর মোহিতলাল তাঁকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলতেও দ্বিধা করেননি,—তাহলেও এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবাবেগের আতিশয্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে বরাবর ক্ষুরধার যুক্তির সরণীকেই অনুসরণ করে গেছেন অব্যাভিচারী ভাবে। বঙ্কিম প্রবন্ধে গদ্যের চাল যুক্তিসিদ্ধ, প্রাঞ্জল, সহজ, সুবোধ্য এবং বাহুল্য বর্জিত। এক কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত জাতীয় রম্যরচনা-ধর্মী প্রবন্ধ সাহিত্যের কথা বাদ দিলে তিনি আর যে সব প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখে গেছেন (যথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বিজ্ঞান রহস্য, সাম্য, অনুশীলন তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদি) সেগুলির রচনারীতির প্রধান লক্ষণই হলো স্পষ্টতা, বস্তু নিষ্ঠতা, যুক্তির সচেতন আনুগত্য, প্রাঞ্জলতা, বাহুল্য এবং কাব্যকতা বর্জন।

বাংলা সাহিত্যের অসামান্য মনীষী এই লেখক উপন্যাস এবং প্রবন্ধ এই দুটি বিভাগকে সম্পূর্ণ দুটি আলাদা রচনার ধারায় বিভক্ত করে যে বিভাগের যা ধর্ম তারই সযত্ন অনুশীলন করেছেন। প্রবন্ধের গদ্যে তিনি উপন্যাসের লাবণ্য আনতে যাননি বা উপন্যাসের গদ্যে প্রবন্ধের ধর্ম আরোপ করতে যাননি। প্রবন্ধ সাহিত্য হলো চিন্তাচর্চার ক্ষেত্র; চিন্তার কয়েকটি মূল অবলম্বন হলো যাথাযথ্য (Precision), সোজাসুজি বলা (directness), সহজ সারল্য (simplicity) এবং স্বচ্ছতা (clarity)। বঙ্কিমের প্রবন্ধে এই সব কয়টি গুণই বহুল পরিমাণে ছিল। চিন্তা পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি অযথা ভাবের কুয়াশা সৃষ্টি করেননি কিংবা কাব্যিকতা করেননি।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক গঠনের পিছনে যেমন বাংলার পুরাতন নব্যন্যায়ীদের ক্ষুরধার ন্যায়ানুগতার প্রভাব ছিল, তেমনি ছিল ইউরোপীয় চিন্তাদর্শনের প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসময়ের আধুনিকতম পাশ্চাত্য চিন্তার ধাঁচ-ধরনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, এমনকি সমাজতান্ত্রিক দার্শনিক কার্ল মার্কসের রচনার সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন। সাম্য এবং কমলাকান্তের দপ্তর বই দুটিতে তার প্রমাণ মিলবে। তবে মুখ্যতঃ তিনি ছিলেন কোঁত-এর প্রত্যক্ষবাদ এবং মিল, বেন, বেন্থাম, অ্যাডাম স্মিথ, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখের পরিপোষিত হিতবাদ বা উপযোগবাদের অনুগামী ভাবুক। বাঙ্গালী পাঠক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষবাদ তথা হিতবাদের মূলকথাগুলির পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়ায় সর্বাধিক কৃতিত্ব বঙ্কিম ন্দ্রের। বিদ্যাসাগর এবং তাঁর ভাবশিষ্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের রচনার মধ্যেও এই দুই চিন্তাদর্শনের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী প্রাবন্ধিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব সম্ভব করে তুলেছিলেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় একদিকে চলেছে উপন্যাসের পর উপন্যাস প্রকাশের আয়োজন, অন্যদিকে চলেছে চিন্তা ও তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধের ভারে তার পাঠ্যবস্তুকে সমৃদ্ধ করে তোলার অন্তহীন চেষ্টা। বোধ হয় খতিয়ে দেখলে শেষোক্ত দিকের আয়োজনটাই বেশী ভারী। বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, লালমোহন বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রমুখ। রমেশচন্দ্র ও হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রণোদনায় বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া

উনিশ শতকের শেষার্ধে বঙ্গদর্শন ব্যতীত প্রচার, আর্যভারত, বান্ধব, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আর যেসব প্রবন্ধলেখক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র বসু, বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

যে সব প্রবন্ধ লেখক পরম্পরার নাম করা হলো তাঁদের প্রায় সকলেই কম বা বেশী পরিমাণে যুক্তিবাদের সাধক ; লাবণ্য বা কান্তি তাঁদের রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অবয়বে লাবণ্য বা কান্তি সংযোজনার সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব যে দুই শিল্পীর, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

এঁদের দুজনের কথা পরে বলছি, তার আগে এইটে বলে নিতে চাই যে, আমাদের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পূর্বাচার্যরা বাংলা গদ্যে লক্ষ্যগোচর ভাবে যে-যুক্তিবাদের প্রচলন করেছিলেন পরে আর বাংলা গদ্যে সেই ধারা সমান নিষ্ঠ সঙ্গে অনুসৃত হয়নি। এতে করে বাংলা গদ্যের ক্ষতিই হয়েছে আমি বলবো। বাঙ্গালীর চিন্তাচর্চার অভ্যাসে এর ফলে শিথিলতা ও পেলবতার অনুপ্রবেশ ঘটে তাকে দার্ঢ্যের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে, তার কাঠামোয় বলিষ্ঠতার অভাব ঘটিয়েছে। সহজাত ভাবে কাব্যপ্রবণ বাঙ্গালী জাতির স্বভাব সুলভ ভাবালুতা, কমনীয়তা, নমনীয়তা, যুক্তিবাদের আশানুরূপ আশ্রয়বিহনে গদ্যের ক্ষেত্রকেও ভাবাতিশয্যের দ্বারা সবিশেষ আক্রান্ত করে তুলেছে, যা হওয়া উচিত ছিল না। পেলবতা ও নমনীয়তার অত্যাধিক চর্চায় বাংলা গদ্যের মেরুদণ্ড ঋজুকঠিন হয়ে উঠতে বার বার বাধা পেয়েছে, যার ফল পরবর্তীকালীন বাঙ্গালী মানসিকতার সুস্থ বিকাশের পক্ষে শুভ হয়নি।

যাই হোক, মোদ্দা কথা হলো, এই কালের প্রবন্ধ সাহিত্যে উনিশ শতকের প্রধান প্রধান গদ্য লেখকদের আচরিত যুক্তিবাদের চর্চা দুর্বল হয়ে পড়ায় তার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, বাঙ্গালী মননশীলতার বাঞ্ছিত বিকাশ ঘটেনি। এই ক্ষতি পরিপূরণের দায়িত্ব একালীন গদ্যলেখকদের নিতে হবে।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে যুক্তি ও কান্তির, মননশীলতা ও রূপময়তার সবচেয়ে সার্থক সমন্বয় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সমসময়ে, আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ভাবোদ্দীপক কত যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার কোন লেখাজোখা নেই। আত্মশক্তি, সমূহ, পরিচয়, স্বদেশী সমাজ, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, রাজা প্রজা, ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা

প্রভৃতি গ্রন্থ সংকলনের ভাবধারা মূলতঃ স্বদেশী ভাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরে কালান্তর এর প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক ভূয়োজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠার অভ্রান্ত পরিচয় তিনি রেখেছেন। সমালোচনা গ্রন্থগুলির মধ্যে পাই প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, বাংলা ভাষা পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থ। এর মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য বইটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দাবী করতে পারে—কি রসভূয়িষ্ঠতা কি মৌলিকতার বিচারে। ঈষৎ লঘু ধাঁচের অথচ মননসমৃদ্ধ রবীন্দ্র-প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র প্রবন্ধ, বাজে লেখা, জীবনস্মৃতি, পঞ্চভূত ইত্যাদি। শান্তিনিকেতন গ্রন্থমালা, মানুষের ধর্ম প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিকে ধর্ম ও মানবিক চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান মনে করা যেতে পারে। কালান্তর তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠ সংকলন।

রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথেরই ভাবশিষ্য। তাঁর গদ্যের চালে স্পষ্ট রবীন্দ্র-প্রভাব অনুভব করা যায়। তবে যেহেতু তিনি ছিলেন মূলতঃ বৈজ্ঞানিক, সেই কারণে তাঁর গদ্যের বাঁধুনিতে যুক্তির বিন্যাসও বড় কম দেখা যায় না। যুক্তি ও কান্তির এক চমৎকার-সুসমঞ্জস রূপ হলো রামেন্দ্র-প্রবন্ধ। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। তাঁর চরিতকথা, বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রতকথা বই দুটি সারগর্ভ অথচ উপাদেয় প্রাবন্ধিকতার ক্ষেত্রে দুটি দিক্‌চিহ্ন জ্ঞান করা যেতে পারে। চরিতকথা বইয়ের বিদ্যাসাগর প্রবন্ধটির কোন তুলনা হয় না। এটি রবীন্দ্রনাথের চারিত্র পূজা বইয়ের সমবিষয়ক প্রবন্ধের চেয়েও উৎকৃষ্ট বলে মনে হয়।

উনিশ শতকের শেষ পাদক এবং বিশ শতকের প্রারম্ভ ভাগে আর যে সকল শক্তিমান প্রাবন্ধিকের দেখা পাই তাঁদের মধ্যে আছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, অজিত চক্রবর্তী প্রমুখ। এঁদের বিচরণের ক্ষেত্র নানামুখী—কারও ইতিহাস কারও সাহিত্য সমালোচনা। অরবিন্দ ঘোষকেও এই নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারতো কিন্তু যেহেতু তাঁর বেশীর ভাগ রচনাই ইংরেজীতে সেই কারণে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর পর্যালোচনায় বিরত রইলাম।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সূচনায়, ঠিক ঠিক কালের হিসাবে ১৯১৫ সালে,

বাংলায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি মাসিক পত্রের অভ্যুদয় হয়, যার নাম বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত—সবুজ-পত্র। আচার্য প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত এই অভিনব সাহিত্য পত্রটি বাংলা ভাষায় চলতি গদ্যরীতির আন্দোলনের প্রবর্তক। বীরবল ছদ্মনামের আশ্রয়ী প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যে সাধু ভাষার চালকে অগ্রাহ্য করে তার জায়গায় মুখের ভাষার ভোলটিকে এনে বসান এবং তাঁর এই দৃষ্টান্ত শক্তিশালী এক নূতন লেখক গোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত ও তাঁদের ওই নয়া চালে লিখতে প্রবৃত্ত করে। এমনকি রবীন্দ্রনাথও এই প্রভাব বৃত্তের বাইরে ছিলেন না। অনুজ ও শিষ্যের দ্বারা অগ্রজ ও গুরুর প্রভাবিত হওয়ার এ এক স্মরণীয় উদাহরণ। কবি এর পর থেকে সাধুভাষায় আর কিছু লেখেননি। চলতি গদ্যকেই তাঁর চিন্তার মূলাশ্রয় করেন। প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে একাধিক প্রথিতযশা গদ্যলেখকের নাম পাই। কতিপয়ের নাম নিচে করছি—'কাব্যজিজ্ঞাসা খ্যাত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাজনীতিজ্ঞ কিরণশংকর রায়, হাল্কা প্রবন্ধের লেখক সতীশ-চন্দ্র ঘটক, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিচারী-খ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার অন্নদাশংকর রায়, সংগীতসাহিত্যের লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরস গদ্যরীতির প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক প্রমথনাথ বিশী, হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি। ফরাসী গদ্যের উজ্জ্বলতা ও প্রসাজ্ঞন, এঁদের সকলেরই রচনাব সামান্য লক্ষণ—গুরু থেকে এটি শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্থকভাবে সংক্রামিত হয়েছিল।

সবুজ পত্রের ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে এই শতাব্দীর তিনের দশকে আর একটি বিদগ্ধ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকা। এই পত্রিকার শিবিরেও একাধিক শক্তিশালী প্রাবন্ধিকের সমাবেশ ঘটেছিল।

বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্যের ঐতিহ্যও নিতান্ত নূতন নয়। শ্রীরামপুরের মিশনারী লেখকদের রচনায় এর সূত্রপাত, পরে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ লেখকদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, জগদানন্দ রায়, রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়দারঞ্জন রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয়-প্রসাদ গুহ, পরিমল গোস্বামী পর্যন্ত এই ধারা দীর্ঘ বিসর্পিত। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্যের চর্চা যত হয় ততই মঙ্গল। সাহিত্যের অন্যান্য ধারা, যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি, এগুলিরও সম্যক্

চর্চা হওয়া দরকার। নয় তো সাহিত্য বিষয়ের উপর একপেশে ঝোঁকের ফলে বাংলা ভাষায় অগ্রগতি একবর্ণাভিমুখী হতে থাকবে, সেটা কোন মতেই কল্যাণপ্রদ হতে পারে না।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে বহু বহু প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি রয়েছেন। আলোচনার স্বল্প পরিসরে তাঁদের বিস্তৃত সমীক্ষণ সম্ভব নয়, এখানে শুধু নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি যদিও জানি নামপঞ্জী নামাবলীর মতই বহিরঙ্গের প্রকাশক মাত্র, অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দ্যোতক নয়। যাঁদের নাম পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তাঁদের নাম আর নতুন করে দেওয়া হলো না—অন্যরা হলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশীলকুমার দে, সুরেদনাথ দাশগুপ্ত, কালিদাস রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, সুশোভন সরকার, নির্মলকুমারবসু, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, গোপাল হালদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, ক্ষুদিরাম দাশ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ইংরেজীতে যাকে বলা হয় personal essay, বাংলায় তাকে বলা হয় রম্য-রচনা। প্রমথনাথ বিশী এর নামকরণ করেছেন 'আত্মভাবী রচনা'। বোধ হয় এই রচনায় ব্যক্তিক অনুভবের প্রাধান্য বলে এর ওইরূপ নামকরণ। ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বর্তমান। ফরাসী সাহিত্যেমঁতেন-এ এর শুরু, ইংরেজীসাহিত্যে এই ধারারপ্র বর্তক হলেন বেকন। পরে উনিশ ও বিশ শতকের বহু বহু লেখক এই রীতির গদ্য রচনায় হাত পাকান। যথা অ্যাডিসন, স্টীল, হ্যাজলিট, চার্লস ল্যাম্ব, গোল্ডস্মিথ, জেরোম কে জেরোম, চেস্টারটন, হিলারার বেলক, বিয়ারবোম, ই ভি লুকাস, স্টীফেন লীকক, গার্ডিনার প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরকে এই বর্গের রচনারীতির আদিরূপ বলা যেতে পারে। তারপর একে একে এই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুজতবা আলী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, পরিমল রায়, জ্যোতির্ময় রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ রঞ্জন প্রভৃতি। হাল্কা চাল আর লঘু মেজাজের এই রচনারীতিটির এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছিলেন শিক্ষক 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের নেতা হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) মাত্র বাইশ বছর কয়েক মাস পরমায়ু পেয়েছিলেন, কিন্তু এই অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তা জগতে যে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিলেন তার প্রভাব এখনও মিলিয়ে যায়নি। বরং যতই দিন যাচ্ছে ততই তাঁর মহিমা নিত্য নতুন আলোকে প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁর শক্তি ও প্রতিভার এ যাবৎ অকৃত নূতনতর ভাষ্য করা হচ্ছে। আজকের দিনের মেজাজ ডিরোজিওর ব্যক্তিত্বকে যথাযথ মাত্রায় উপলব্ধির খুবই অনুকূল। কেননা বিদ্রোহী চিন্তা আজ বাংলার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আর পুরাতন মূল্যবোধগুলিকে দেশকালের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখার প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছে।

ডিরোজিও তাঁর হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের যদি কিছু শিখিয়ে গিয়ে থাকেন তো তা হলো স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস কোন কিছুকেই অপ্রতিবাদে গ্রহণ না করার বিচারপরায়ণ মনোভাব এবং ভাবাবেগের বদলে যুক্তির নিকষে সবকিছুর মূল্য নিরূপণ। শাস্ত্রবাক্যই হোক আর আপ্তবাক্যই হোক আর প্রথা ও আচারসিদ্ধ প্রবল দেশজসংস্কারই হোক, যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করে যদি দেখা যায় যে তার মধ্যে ফাঁকি ও মেকি আছে তাহলে তাকে বর্জন করতে কোনোরূপ দ্বিধা করা উচিত নয় এই শিক্ষা ডিরোজিওর। আর এই শিক্ষার দ্বারা পুষ্ট হয়েই তাঁর ইয়ং-বেঙ্গলভুক্ত শিষ্যরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদের বাংলাদেশে শিক্ষায় সমাজ-সংস্কারে জ্ঞানচর্চায় ধর্মভাবনায় সাহিত্যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। ফল দিয়েই গাছের পরিচয়ঃ শিষ্য দিয়েই গুরুকে চেনা যায়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রাম গোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারী-চাঁদমিত্র, রাধানাথ সিকদার, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নানা বিভাগের কৃতি ও অবদানকে যদি মাপকাঠি স্বরূপে গ্রহণ করা যায় তাহলে মানতেই হবে যে তাঁদের যিনি গুরু ছিলেন সেই ডিরোজিওর প্রেরণার উৎস থেকেই তাঁরা তাঁদের সকল শক্তি আহরণ করেছিলেন। যিনি মাত্র তেইশ

বছরের অপূর্ণ আয়ুর সীমার মধ্যেই এমন একটা বৃহৎ প্রভাবশালী শিষ্যসম্প্রদায় গড়ে যেতে পারেন তাঁর প্রতিভার কি কোন তুলনা আছে ?

কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার, এই অপরিসীম প্রতিভাধর মানুষটিকে তাঁর জীবদ্দশায় কত না লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর শিক্ষায় অনন্যতার জন্য। ধর্ম-বিহীন শিক্ষাদানের অভিযোগে হিন্দু কলেজ থেকে তাঁর চাকরি যায়। মাত্র চার বছর তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার কার্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু এই অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর রক্ষণশীল অংশটি হিন্দু ধর্ম বিপন্ন হবার আশংকায় অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন এবং শেষ অবধি ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কলেজ থেকে অপসারিত করেন। এই ষড়যন্ত্রকারী দলের নেতা ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব আর তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন দেওয়ানরামকমল সেন। যাঁদের দানে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম প্রভাবশালী অংশ. সুতরাং কলেজ পরিচালনায় তাঁদের বক্তব্যকে মর্যাদা না দিয়ে উপায় ছিল না! কলেজসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি থাকলে সেই আপত্তির কারণ দূর করতে হবে বই কি। বিত্তের কৌলীন্য আর রক্ষণশীলতা প্রয়াশ সহাবস্থান করে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ধর্মের গোঁড়ামি ধর্মান্ধতার প্রভাব পুষ্ট হয়ে সত্যের টুঁটি চেপে ধরেছিল। এক সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশ প্রাণ সৎ তরুণ শিক্ষক ও চিন্তানায়ক কপট হিন্দুয়ানির ধর্মধ্বজিতার বলি হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর আগে হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী থেকে রাজা রামমোহন রায়ের অপসারণের মূলেও ছিলেন এই গোঁড়ার দল।

এ কথা অবশ্য খুবই সত্য যে, ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রভাবে তাঁর ছাত্রেরা গোড়ার দিকে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন : নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ও সুরাপানের অমিতাচার তাঁদের কিয়ৎপরিমাণে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। এতটা না করলেও তাঁরা পারতেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু কলেজের রক্ষণশীল পরিচালকদের কাছে ডিরোজিওর ছাত্রদের এই পানভোজনগত স্বেচ্ছাচার তাঁর বিতাড়নের পক্ষে একটা প্রধান যুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৎকালীন ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন-এর একটি প্রবন্ধের বর্ণনা অনুযায়ী 'the native managers of the College were alarmed at the progress which some of the pupilswere making by actually cuting their way through ham and beef and

wading to liberalism through tumblers of beer.' অর্থাৎ ছাত্রদের একাংশ যেভাবে শূকর ও গোমাংস ভক্ষণের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে আত্মো-ন্নতি ঘটাচ্ছিল এবং পিপা পিপা মদ গিলে ঔদার্যবাদের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছিল তাইতে কলেজের দেশী কর্তারা প্রমাদ গুণেছিলেন। তার উপর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ তাঁদের আরও শঙ্কিত করে তুলেছিল।

কিন্তু ডিরোজিওর সপক্ষে বলবার কথা এই যে, তিনি তাঁর ছাত্রদের কাউকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করেননি কিংবা তাঁদের অমিতাচারের পক্ষেও উৎসাহ যোগাননি। ছাত্রদের কেউ কেউ যদি তাঁর শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে স্বধর্ম-দ্রোহিতা কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে পা বাড়ায় তাহলে তার দায়িত্ব তাঁর নয়। আসলে ডিরোজিও যেটা করতে চেয়েছিলেন তা হলো, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির স্ফুরণ। তাঁর মনের গড়ন ছিল যুক্তিবাদীর, সেইজন্য তিনি প্রতিটি প্রত্যয় ও মূল্যবোধকে যুক্তির তোলদণ্ডে পরিমাপ করে তাদের সত্যাসত্য নিরূ-পণের কথা বলতেন, শাস্ত্রবচন বলেই শাস্ত্রবচনকে মর্যাদা না দেওয়ার পরামর্শ দিতেন। দার্শনিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন খানিকটা অজ্ঞেয়বাদী (অ্যাগনস্টিক)। লক, রীড, হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের রচনার তিনি ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের তিনি তাঁদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোল-বার চেষ্টা পেতেন। হিন্দু কলেজে যদিও তিনি ইংরেজী ও ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর দার্শনিক প্রবণতার জন্য ইংরেজী ভাষা আর ইতিহাস শিক্ষার ধারার মধ্যে দার্শনিক জিজ্ঞাসাকে চমৎকার ভাবে এনে মিশিয়েছিলেন। আর তাঁর ছাত্রেরাও ওই শিক্ষাপ্রভাবে যুক্তিবাদী দার্শনিকতায় বিশেষভাবে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ছাত্রদের যুক্তিবুদ্ধির বিকাশের জন্য তিনি শুধু তাঁর ক্লাশরুমকেই ব্যবহার করতেন না, ক্লাশরুমের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করতেন এবং বাড়ীতেও তাদের ডেকে নিয়ে তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা কইতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের স্বাধীনবুদ্ধির বিকাশ আর আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দানের জন্য 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামক একটি বিতর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানকার বৈঠকগুলিতে ধর্ম, সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। ছাত্রদের স্বেচ্ছাচারবৃত্তিকে প্ররোচিত করা নয়, পরন্তু তাদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করাই ছিল বস্তুত ডিরোজিওর সকল চেষ্টা ও যত্নের লক্ষ্য।

'ইয়ং বেঙ্গল'দের অমিতাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু তাঁদের ত্রুটী-বিচ্যুতি অনেকটাই ক্ষমাপ্রবণ মনোভাব নিয়ে বিচার করা যায় যদি মনে রাখা যায় যে, তাঁদের সকলেরই বয়স নিতান্ত কচিকাঁচা আর তরুণ বয়সের উন্মাদানায় মানুষ কত কিই না ভুল করে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁদের নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ আর সুরাপানের আধিক্যজনিত উত্তেজনা তাঁদের জীবনাচরণের বহিরঙ্গ দিক ছিল মাত্র, ওই আচরণগত স্খলন তাঁদের অন্তর্জীবনকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি এ কথার প্রমাণ এই যে,ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত ডিরোজিও শিষ্য এই প্রতিভাবান তরুণেরা পরবর্তী কালে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, সকলেই তাঁরা আত্মস্থ আর স্থিতধী হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের প্রতিভায় দানে বাংলার তদানীন্তন সমাজ ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রচর্চার নতুন দিগ্দর্শনের সত্রপাত করেছিলেন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক হয়েছিলেন একজন দায়িত্বশীল উচ্চ রাজকর্মচারী, রামতনু লাহিড়ী সততা ও সত্যনিষ্ঠার এক মূর্তিমন্ত বিগ্রহ, প্যারীচাঁদ মিত্র ভারতের মদ্য নিবারণী সমিতির প্রথম সম্পাদক এবং বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন বিভাগের (উপন্যাস) উল্লেখযোগ্য পথপ্রদর্শক, রাধানাথ সিকদার একজন প্রসিদ্ধ গাণিতিক এবং হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কারের মূল কারক, শিবচন্দ্র দেব একজন প্রথম শ্রেণীর জ্ঞানতাপস ও কর্মযোগী, রাজা দিগম্বর মিত্র একজন বদান্য দাতা, এমনি আরো অন্যান্যেরা। শিষ্যদের এই উজ্জ্বল কীর্তিকলাপ দেখে কি মনে হয় ডিরোজিও তাঁদের প্রতি ভুল শিক্ষা দিয়েছিলেন ? ভুল শিক্ষা তো তিনি দেনইনি, উল্টে, তাঁদের মধ্যে প্রকৃত সত্যানুরাগ ও দেশানুরাগের সঞ্চার করে তাঁদের চরিত্রের বনেদটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। গুরু বড় না হলে শিষ্য সম্প্রদায় কখনও এত বড় হতে পারে ?

ডিরোজিও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রাপ্য সম্মান তো পানইনি বরং তাঁর মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল কম বেশী বিস্মরণের ধূম্রজালে অস্পষ্ট হয়ে রয়েছিলেন। তাঁকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়েছে একাধিক কারণে। তাঁর শোচনীয় অকাল মৃত্যু প্রথম কারণ, অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে সমসাময়িক কালের আলোচকদের পক্ষে তাঁর প্রভাব পরিমাপের অক্ষমতা। বাংলার উনিশ শতকের ইতিহাসে ডিরোজিওর ভূমিকার গুরুত্ব কোথায় ও কিসে নিহিত সেই বোধটাই অনেক-

কাল পর্যন্ত অস্বচ্ছ ছিল। এ ভিন্ন তাঁর ফিরঙ্গ বংশানুক্রম (তিনি পর্তুগীজ পিতার সন্তান ছিলেন) তাঁকে আরও বেশী ভুলবোঝার অবকাশ দিয়েছে। তিনি প্রথম বয়সে বায়রন, মুর আর স্কটের ছাঁদে যে সমস্ত কাব্যকবিতা লিখেছেন তার ভিতর তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষের প্রতি গভীর আকর্ষণের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু কুসংস্কার সহজে মরে না। তাই ইঙ্গ ভারতীয় মাত্রেরই দেশপ্রেমে আমাদের সন্দেহ। এই অযৌক্তিক মনোভাব পূর্বে আরও কত প্রবল ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সমস্ত নানা কারণ মিলিয়ে ডিরোজিওকে তাঁর কালে এবং তার পরেও অনেকদিন অল্পবিস্তর অগ্রহনীয় করে রেখেছিল তাঁর দেশবাসীর কাছে।

ডিরোজিওর উপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই লেখন টমাস এডোয়ার্ডস ১৮৮৪ সালে। তাঁর বইয়ের নাম 'হেনরী ডিরোজিও: দি ইউরেশিয়ান পোয়েট, টীচার অ্যাণ্ড জার্নালিস্ট।' অবশ্য তার আগে রাজনারায়ণ বসু তাঁর সেকাল আর একাল' (১৮৮৪) এবং 'হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৫) বই দুইখানিতে ডিরোজিও সম্বন্ধে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক তথ্য সংকলিত করেন। তবে প্রথম জীবনী গ্রন্থের সম্মান পূর্বোক্ত বইয়ের প্রাপ্য। এই বইয়ে সন-তারিখের কিছু ভুল ছিল। সেই সমস্ত সন-তারিখের সংশোধন করে এলিয়ট ওয়াল্টার ম্যাজ ১৯০৫ সালে তার 'হেনরী ডিরোজিও দি ইউরেশিয়ান পোয়েট অ্যাণ্ড রিফর্মার' বইখানি প্রকাশ করেন। এটি ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার গ্রন্থরূপ। সংক্ষিপ্ত হলেও বইখানিতে কিছু নয়া তথ্য ছিল। এ যাবৎ অব্যবহৃত সূত্র থেকে গ্রন্থকার সেইগুলির চয়ন করেন। টমাস এডোয়ার্ডস তাঁর বইতে ডিরোজিওর জন্মতারিখ ১৮০৯ সালের ১৩ই এপ্রিল বলে বর্ণনা করেছেন; সেটা ঠিক নয়. ম্যাজ দেখিয়েছেন তা হবে ১৮ এপ্রিল। তার উপর টমাস এডোয়ার্ডস এর বইয়ে ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে চাকরিতে যোগদানের বৎসর বলা হয়েছে ১৮২৮। সেটাও ঠিক নয়, এটা হবে ১৮২৭। এভিন্ন ম্যাজ ডিরোজিওর গুণবতী ভগ্নী অ্যামেলিয়ার সম্পর্কেও কিছু নূতন তথ্যাদি সংযোগ করেছেন তাঁর বইয়ে।

বর্তমান শতকের বিভিন্ন পর্বে একাধিক লেখক তাঁদের বইয়ে বা প্রবন্ধে ডিরোজিওর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শিবনাথ শাস্ত্রী ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' ১৯০৩ ও 'আত্মচরিত' ১৯১৮); ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('সংবাদপত্রে সেকালে কথা', দুই খণ্ড); যোগেশ-

চন্দ্র বাগল ('ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও ডিরোজিও) ; বিনয় ঘোষ ('বিদ্রোহী ডিরোজিও') সুশোভন সরকার (অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'স্টাডিজ ইন দি বেঙ্গল রিনায়েসেন্স' গ্রন্থে সংকলিত 'ডিরোজিও অ্যান্ড ইয়ং বেঙ্গল' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি পরে শ্রীসরকারের 'বেঙ্গল রিনায়েসেন্স অ্যান্ড আদার এসেজ' বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, প্রকাশক পিপলস পাবলিশিং হাউস, বোম্বাই) এ ভিন্ন গবেষক লেখক দিলীপকুমার বিশ্বাস সম্প্রতি 'রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল' নামক এক বিস্তারিত প্রবন্ধে ('ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট) রামমোহনের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছেন। সম্প্রতি ম্যাজ-এর লিখিত 'হেনরী ডিরোজিও দি ইউরেশিয়ান পোয়েট অ্যান্ড রিফর্মার' বইখানি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হেয়েছে। সম্পাদনা করেছেন সুবীর রায় চৌধুরী। বইটিতে ম্যাজ এর রচনাটি ছাড়াও ১৮৪৩ সালের অক্টোবর সংখ্যা ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সি. এম. মন্টেগু লিখিত ডিরোজিও সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, এপ্রিল ১৯৫৯ সংখ্যা প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সুশোভন সরকারের হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর অপসারণ ব্যাপারে কলেজ কমিটির কর্তাদের আচরণ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাটকেও ডিরোজিও রূপায়িত হয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উৎপল দত্তের 'ঝড়' যাত্রাপালার উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি সিনেমায়ও, এই কাহিনী তিনি রূপান্তরিত করেছেন।

ডিরোজিও সম্পর্কে সবশেষ কথা এই যে, এ যাবৎ রামমোহন রায়কেই নব্য বাংলার অবিসম্বাদী স্রষ্টা রূপে তাবৎ সম্মান অর্পণ করা হয়েছে। রামমোহন যে নব্য বাংলার গুরু, নব্য বাংলার কেন, নব্য ভারতের আদি স্রষ্টা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, তিনি ছিলেন মূলত সংস্কারক, র‍্যাডিকাল বা বিদ্রোহী চিন্তানায়ক নন। সেই র‍্যাডিকাল চিন্তাবিদ্রোহের সম্মান যদি কাউকে দিতে হয় তো তিনি—ডিরোজিও। প্রকৃতপক্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অব্যবাহত পরবর্তীকালের বিদ্রোহীরা ভাবসাযুজ্যের দিক থেকে ডিরোজিওরই সব ঠিক নিকট আত্মীয়, রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ বললেও চলে।